HISTORY OF INDIA

PART I

CONTAINING A BRIEF ACCOUNT OF INDIA DURING
HINDU AND MAHOMEDAN RULE.

BY

NILMANI MUKHOPADHYAYA. M. A.

ant Professor of Sanskrit, Presidency
College.

FOURTH EDITION.

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

প্রথম ভাগ।

অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমানদিগের অধিকারকালীন
ভারতরাজ্যের পুরাবৃত্ত।

প্রেসিডেন্সি কালেজের সহকারী সংস্কৃতাধ্যাপক
শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল,
প্রণীত।

চতুর্থ সংস্করণ।

CALCUTTA.

Printed and Published by B. L. Chakravartty.

NEW SCHOOL-BOOK PRESS.

No. 8 Dixon's Lane.

1878.

বিজ্ঞাপন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রথম ভাগ মুদ্রিত হইল। হিন্দু ও মুসলমান জাতি কি প্রকারে ভারতরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, এই পুস্তকে সেই সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। কাওয়েলের মুদ্রিত এলফিনিষ্টনই ইহার প্রধান আদর্শ। স্থানে স্থানে মরে, মার্সমান ও লেথব্রিজের ইতিহাস হইতেও যথেষ্ট সাহায্য গ্রহণ করা গিয়াছে।

হিন্দুদিগের পুরাবৃত্ত নানাগ্রন্থ ও প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে, তৎসমস্ত উল্লেখ করা অনাবশ্যক। হিন্দু পুরাবৃত্ত সংক্রান্ত অনেকানেক বিষয় সংশয়াকীর্ণ, সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। কিরূপ যুক্তিদ্বারা সেই সকল বিষয়ের যাথার্থ্য সমর্থিত হইয়াছে, তাহা না জানিলে পাঠকবর্গের সংশয় অপনয়ন ও মনের তৃপ্তি হয় না। কিন্তু এই পুস্তকখানি কেবল অল্পবয়স্ক বালকদিগের জন্য প্রণীত হইল; যুক্তির উপর যুক্তি প্রকটন করিতে গেলে, কদাপি উহাদের বোধগম্য হইবেনা, প্রত্যুত নিতান্ত বাহুল্য হইয়া পড়িবে। সুতরাং অগত্যা কেবল স্থূল স্থূল সিদ্ধান্তগুলি লিখিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইল। শিক্ষক ও শিক্ষাকার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক মহাশয়েরা যদি কোন বিষয়ের বাস্তবিকতায় সন্দিহান

হন, কোন না কোন মুলগ্রন্থ দেখিলেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবেন।

পরিশেষে বক্তব্য, হিন্দুজাতির পূর্ব্বতন বিবরণের মধ্যে অনেকগুলি যুক্তিসিদ্ধ নয়; হয় সম্ভাবনা অনুসারে পরি-কল্পিত, না হয়, জনশ্রুতি হইতে প্রাপ্ত। সেই সকল বিবরণ পাঠকগণ চাই বিশ্বাস করুন চাই ছাড়িয়াদিউন; উহার উপাদেয়তা সম্পাদন করিবার জন্য গ্রন্থকর্ত্তার আপাততঃ কিছু বলিবার নাই।

সংবৎ ১৯২৯, ১১ ই অগ্রহায়ণ
কলিকাতা।

শ্রীনীলমণি শর্ম্মা

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

প্রথম ভাগ।

বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী
ডাক সংখ্যা ৯৫৫
পরিগ্রহণ সংখ্যা ৯৫
পরিগ্রহণের তারিখ ০১/০২ ২০০৭

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অবতরণিকা।

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষ সভ্যতা ও বিদ্যার অনুশীলনের জন্য প্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষে নানাপ্রকার পণ্য দ্রব্য উৎপন্ন হয়, এবং খনিতে মহামূল্য রত্ন সকল পাওয়া যায়। এই জন্য বিদেশীয় রাজারা ও বণিকেরা বরাবর ইহার উপর সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন। অধিক কি, গ্রীসদেশের প্রাচীন ইতিহাস লেখকেরা এই দেশকে একটি সোণার রাজ্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষে প্রকৃতির শোভা যেমন মনোহর, তেমনি নানাপ্রকার। ইহার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের আবহাওয়া, ফসল, জন্তু ও দৃশ্য এত বিসদৃশ যে, পণ্ডিতেরা এই রাজ্যকে পৃথিবীর একখানি তসবির বলিয়া বর্ণন করেন।

ভারতবর্ষের উত্তর সীমায় হিমালয় পর্ব্বত। হিমালয়ের

উচ্চতা পৃথিবীস্থ সমস্ত পর্ব্বত অপেক্ষা অধিক। এভারেষ্ট বা গৌরীশঙ্কর নামে ইহার যে একটি শৃঙ্গ আছে, উা ভূতল হইতে প্রায় ২৯ হাজার ফুট উচ্চ। হিমালয়ে প্রকৃতির নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়। উহার নিম্নভাগে উষ্ণদেশের ফল ও ফসল জন্মে; মধ্যভাগে চাল, গম প্রভৃতি উৎপন্ন হয়; কিন্তু তাল খর্জ্জুরাদি উষ্ণদেশ-সুলভ ফল পাওয়া যায় না। হিমালয়ের উপরিভাগে বৎসরের অধিকাংশ সময় বরফে আচ্ছন্ন থাকে। উহাতে ফর, পাইন প্রভৃতি শীতল দেশের বৃক্ষ জন্মে, এবং যে সকল ফল, ফুল ও জানোয়ার ইউরোপের উত্তর অঞ্চলে সুলভ, তাহা ভূরি ভূরি মিলিয়া থাকে।

ভারতবর্ষ হিন্দুস্থান ও দাক্ষিণাত্য এই দুই প্রধান খণ্ডে বিভক্ত। হিন্দুস্থানের মধ্যে অনুগঙ্গদেশে বাঙ্গালা, বিহার, এলাহাবাদ, অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড এই পাঁচটি বিভাগ আছে। গঙ্গা নদী শাখা প্রশাখা সমূহে প্রবাহিত হইয়া, এই দেশকে এমনি উর্ব্বর করিতেছে, যে ইহাতে চাল, গম, চিনি, নীল প্রভৃতি উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। গঙ্গা যমুনার অন্তঃপাতী দোয়াব প্রদেশের অনেক স্থলে কৃত্রিম নদীর দরকার আছে। ইহাতে শীতকালে শীত বড় প্রবল না হওয়াতে, এক ফসল গম জন্মে, এবং গ্রীষ্মকালে তাদৃশ গরম বোধ হয় না বলিয়া, এক ফসল চাল হয়।

এক বৃহৎ মরুভূমি যমুনার পশ্চিম হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। ইহা দেখিলে আরব ও আফ্রিকার মরুভূমির কথা মনে পড়ে।

অন্তঃসিন্ধু প্রদেশ ভারতবর্ষের চরম পশ্চিম সীমা। পঞ্জাব মুলতান, সিন্ধু ও কচ্ছ ইহার অন্তর্গত। সিন্ধু নদ ও উহার পাঁচটি শাখা এই বিভাগের অত্যন্ত উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতেছে। অধুনা ইংরাজদিগের সুশাসনগুণে অন্তঃসিন্ধু প্রদেশের কৃষি ও বাণিজ্যের ভূয়সী উন্নতি হইয়াছে।

বিন্ধ্য পর্ব্বত দাক্ষিণাত্যের উত্তর সীমা; কাম্বে উপসাগর হইতে বঙ্গসাগর পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আছে। ইহার উচ্চতা অতি সামান্য। ইহার বড় বড় শৃঙ্গ দুই হাজার ফুট অপেক্ষা অধিক উচ্চ নয়। নর্ম্মদানদী বিন্ধ্যপর্ব্বতের পাদদেশ দিয়া পূর্ব্বপশ্চিমে প্রবাহিত হইতেছে। নর্ম্মদার উভয়তীরের সন্নিহিত ভূভাগকে মধ্য ভারতবর্ষ বলে। মালব গোন্দয়ানা ও খান্দেশ উহার অন্তর্গত। বিন্ধ্যাদ্রির পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রান্ত হইতে দুইটি পর্ব্বত নির্গত হইয়া মলবার ও করমণ্ডল উপকূল দিয়া গমন করিতেছে। উহাদিগকে পূর্ব্বঘাট ও পশ্চিম ঘাট বলে। নীলগিরি, মহীসুরের দক্ষিণ দিয়া পূর্ব্বপশ্চিমে প্রবাহিত হইয়া, উহাদিগকে পরস্পর মিলিত করিয়া দিয়াছে। শেষোক্ত তিনটি পর্ব্বতের মধ্যে যে ভূভাগটি আছে, তাহাই দাক্ষিণাত্যের প্রধান পরিসর। উহার দক্ষিণপশ্চিম বিভাগ অপেক্ষাকৃত অনেক উন্নত ও ছোট ছোট পাহাড়ে আকীর্ণ। এই স্থানই মহারাষ্ট্রজাতির জন্মভূমি। কৃষ্ণা, গোদাবরী, তুঙ্গভদ্রা ও কাবেরী নদী উক্ত পরিসর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। যদিও উহার অনেক স্থল জঙ্গল, পাহাড় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মরুভূমিতে আকীর্ণ, তথাপি উহার

অন্তর্গত অধিকাংশ ভূখণ্ড কৃষিগুণে ফল, পুষ্প ও শস্যে সুশোভিত হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষের দৈর্ঘ্য কাশ্মীর হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত ১৯০০ মাইল। প্রস্থ; করাচি হইতে সুদিয়া পর্য্যন্ত ১৫০০ মাইল। ইহার পরিসর ১২৮৭০০০ বর্গ মাইল। ইহাতে প্রায় ২৪ কোটি লোকের বাস।

ভারতবর্ষের প্রাচীন পণ্ডিতেরা নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন, কিন্তু ইতিহাস রচনা বিষয়ে যৎপরোনাস্তি আলস্য ও ঔদাস্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই জন্য মুসলমানদের আক্রমণের পূর্ব্বে এদেশের যাহা কিছু পুরাবৃত্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই গোলমালে পরিপূর্ণ এবং বিশ্বাসের অযোগ্য। গ্রীসদেশীয় ইতিহাসলেখকেরা এবং চীনদেশীয় ভ্রমণকারীরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়া গিয়াছেন, উহাই আমাদের প্রধান অবলম্বন। আর ও এদেশীয় প্রাচীন রাজগণ তাম্রফলকে খোদিত করিয়া যে সকল অনুশাসনপত্র ও দানপত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা নানা স্থান হইতে খুঁড়িয়া বাহির করিয়া অনেক নূতন নূতন বিষয় প্রকাশ করা হইতেছে। ভাষাবিৎ পণ্ডিতেরা সংস্কৃত গ্রীক লাটিন প্রভৃতি ভাষার পরস্পর সম্বন্ধ সবিশেষ অনুশীলন করিয়া, যে সকল বিষয় কোনও ইতিহাসে পাওয়া যায় না, উহার উদ্ধার করিয়া লইতেছেন। এই সকল উপায় দ্বারা ভারতবর্ষের পূর্ব্বকালীন বৃত্তান্ত যৎকিঞ্চিৎ অবগত হওয়া গিয়াছে। তাহার স্থূল বিবরণ লিখিত হইতেছে।

অতি পূর্ব্বকালে আসিয়ার মধ্যদেশে আর্য্য নামে এক

জাতি বাস করিতেন। তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে স্বদেশ ছাড়িয়া প্রস্থান করেন। প্রথম দল পশ্চিমাভিমুখে যাইয়া তুরস্কদেশ দিয়া ইউরোপে প্রবেশ করেন। তাঁহারা পূর্ব্বে গ্রীক, লাটিন, গথ, কেল্ট, টিউটন প্রভৃতি নামে বিখ্যাত ছিলেন। এখন ইংরাজ, ফরাসি, জর্ম্মাণ প্রভৃতি নাম ধারণ করিয়াছেন। তৎপরে আর এক দল পারস্য দেশে ছড়িয়া পড়েন। যে সকল অগ্নির উপাসক পারসিরা অধুনা বোম্বাইতে সওদাগরী বিষয়ে বিখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহারা সেই পারস্যবাসী আর্য্যদিগের সন্তান। সর্ব্বশেষে তৃতীয় দল পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া সিন্ধু নদ পার হইয়া, পঞ্জাবে আসিয়া উপস্থিত হন।

সরস্বতী ও দৃষদ্বতী * নদীর অন্তঃপাতী ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে যে জনপদের বিষয় শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, উহাই তাঁহাদের আদিম বাসস্থান। তাঁহারা এদেশের আদিমবাসীদিগকে দস্যু বলিতেন। বেদে দস্যু ও আর্য্যদিগের মধ্যে অনেক সংগ্রামের কথা নির্দ্দিষ্ট আছে। দস্যুরা সেই সকল যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া অনেকে দাসত্ব স্বীকার করিল; বোধ হয়, হাড়ি, মুচি, ডোম, বাগদি প্রভৃতি ইতরজাতি তাহাদের সন্তান। কতক বা চতুর্দ্দিগস্থ পাহাড়ে ও জঙ্গলে আশ্রয় লইল। উহারাই এখন ভীল, খন্দ, কুকি, সাঁওতাল প্রভৃতি নামে পরিচিত হইতেছে। কিন্তু আদিমবাসীদের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত সভ্য ছিল, তাহারা বিন্ধ্যপর্ব্বত পার হইয়া গিয়া দাক্ষিণাত্যের স্থানে স্থানে রাজত্ব স্থাপন

* দৃষদ্বতী—গাগরা নামে পরিচিত। ২

করিল। ক্রমে ক্রমে আর্য্যেরা সমুদয় হিন্দুস্থান জয় করিলেন। গুজরাট হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত তাঁহাদের আধিপত্য স্থাপিত হইল, এবং সমুদায় দেশ আর্য্যাবর্ত্ত নামে খ্যাত হইল।,

ভারতবর্ষবাসী আর্য্যদিগের আদিম ভাষা সংস্কৃত। ভাষাবিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে সংস্কৃত গ্রীক,লাটিন প্রভৃতি একই মূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত, প্রাকৃত হইতে অধুনাতন হিন্দি, পঞ্জাবী, সৈন্ধবী, মহারাষ্ট্রী, বাঙ্গালা, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষার উদ্ভব হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত চারিভাষাতে এদেশীয় আদিম ভাষার বিলক্ষণ মিশেল আছে। অতএব বোধ হয়, সিন্ধু মহারাষ্ট্রা, বাঙ্গালা ও উড়িষ্যাবাসী আর্য্যেরা ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদের সহিত অধিক পরিমাণে মিশ্রিত হইয়াছেন।

দাক্ষিণাত্যের লোক আকার প্রকার, আচার ব্যবহার ও ভাষা এই সকল বিষয়েই আর্য্যজাতি হইতে বিভিন্ন। দাক্ষিণাত্যে যত ভাষা প্রচলিত তন্মধ্যে তৈলঙ্গী ও তামিল ভাষা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। এই দুই ভাষাতে অনেকানেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের ভাষাগুলি হিন্দি, বাঙ্গালা প্রভৃতির সহিত কোন অংশে মেলেনা। সত্য, উহাদের মধ্যে অনেক সংস্কৃত শব্দ চলিত দেখা যায়, কিন্তু সেই সকল শব্দ দ্বারা ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয়েরই প্রতীতি হয়, আর কোন প্রকার পদার্থের প্রতীতি হয় না। অতএব বোধ হইতেছে, দাক্ষিণাত্যের অধিবাসীরা প্রথমে হিন্দু ছিলেন না, আর্য্যজাতির এদেশে আসিবার অনেক পরে

হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করেন, এবং সেই সঙ্গে অনেকানেক সংস্কৃত শব্দও গ্রহণ করেন; কিন্তু কদাচ আপনাদের মাতৃ-ভাষার অনাদর করিয়া সংস্কৃত ভাষার আশ্রয় লন নাই। কোন্‌সময়ে যে আর্য্যেরা বিন্ধ্যপর্ব্বত ভেদ করিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ পূর্ব্বক আপনাদের ধর্ম্মপ্রচার ও প্রভুত্ববিস্তার করিতে আরম্ভ করেন, তাহার নিশ্চয় হয় না। জনশ্রুতি আছে যে মহামুনি অগস্ত্য দাক্ষিণাত্যে জ্ঞান ও বিদ্যার প্রথম প্রচার এবং তামিল ভাষাতে ব্যাকরণ ও চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রথম রচনা করেন। দাক্ষিণাত্যে পাণ্ড্য ও চল নামে যে দুইটি সমৃদ্ধিশালী প্রাচীন রাজ্য ছিল, উহার স্থাপনকর্ত্তরা আদৌ হিন্দুস্থানের অধিবাসী ছিলেন; বোধ হয়, খৃষ্টীয় শকের পূর্ব্বে পঞ্চমশতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে গিয়া বাস করেন।

অনেকে অনুমান করেন, অযোধ্যার অধীশ্বর মহারাজ রামচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম দাক্ষিণাত্যে হিন্দুদের আধিপত্য বিস্তার করিতে যত্নবান হন। তিনি অগস্ত্য ঋষির সমকালবর্ত্তী-ছিলেন। কারণ রামায়ণে বর্ণিত আছে, যে রামচন্দ্র ঐ মুনি হইতে-দিব্য অস্ত্র সকল লাভ করিয়া তাঁহারই আদেশে গোদাবরীতীরে জনস্থাননামক জনপদে অবস্থিতি করেন। কিন্তু অযোধ্যাপতি এই প্রদেশে নিজ অধিকার স্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই, লঙ্কার অধিপ দুর্জ্জয় দশাননকে সবংশে সংহার করিয়াই ক্ষান্ত হন। রামচন্দ্রের সময়ে হিন্দুরা দাক্ষিণাত্যের বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। তাহা না হইলে, যে সকল লোককে সহায় করিয়া তিনি রাবণের

শাসন করেন, তাঁহাদিগকে বানর, ভল্লুক বা পক্ষী বলিয়া বর্ণন হইত না। অতএব বোধ হয়, সুগ্রীব, জাম্বুবান, হনূমান ও জটায়ু এদেশের আদিমবাসী ভিন্ন ভিন্ন দলের অধিপতি ছিলেন। সকলেই রাক্ষসগণের উৎপাতে ব্যতিব্যস্ত হন, পরে বীরবর রামচন্দ্রের পক্ষ হইয়া দশাননের নিপাত করেন। এই ঘটনাটি সূর্য্যবংশের মধ্যে অত্যন্তবিখ্যাত। রাজা রামচন্দ্রের পর সূর্য্যবংশের অবনতি আরম্ভ হয়, এবং চন্দ্রবংশের প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। কুরুক্ষেত্রের সংগ্রাম চন্দ্রবংশের মধ্যে প্রসিদ্ধ ঘটনা। এই যুদ্ধকালে প্রায় সমুদায় ভারতবর্ষে আর্য্যজাতির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। মদ্ররাজ্যের * অধিপতি শল্য নকুলসহদেবের মাতুল ছিলেন, দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণ গুজরাটে গিয়া প্রভুত্ব স্থাপন করেন, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন মণিপুরের রাজকন্যাকে বিবাহ করেন, এবং তাঁহার পুত্র বভ্রুবাহন সেই রাজ্যের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইত্যাদি ঘটনা সকল অনুধাবন করিয়া দেখিলে উক্ত বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না।

ঋগ্বেদ সংহিতা পাঠ করিলে, আর্য্যদের আদিম আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মের বিষয় অনেক জানিতে পারা যায়। কৃষি ও পশুপালন দ্বারা তাঁহাদের উপজীবিকা চলিত। তাঁহাদের মধ্যে বংশের প্রধান পুরুষই স্বদলের উপর প্রভুত্ব চালাইতেন, এবং হোম পূজা প্রভৃতি সমুদয় ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান বিষয়ে প্রধান যাজকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। দস্যুদমন,

* মান্দ্রাজনগর ও ইহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী জনপদ প্রাচীন মদ্ররাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

প্রচুরবৃষ্টিপাত, শস্যবৃদ্ধি ও গাভীতে দুগ্ধোৎপত্তি, এই সকল ফল কামনা করিয়া ইন্দ্র, অগ্নি,বায়ু, বরুণ,সূর্য্য, উষা,অশ্বিনী-কুমার প্রভৃতি দেবতাগণের হোম পূজায় দীক্ষিত হইতেন; এবং যজ্ঞে সোমলতার রস পান করিয়া আমোদ অনুভব করিতেন। প্রথম হইতেই আর্য্যদিগের ঘরবাড়ী, যুদ্ধের রথ, লোহার সাঁজোয়া, নৌকা প্রভৃতি ছিল এবং তাঁহাদের মধ্যে ব্যবসার জিনিষ খরিদ বিক্রী করা চলিত। অতএব বোধ হয় যে, তাঁহারা তৎকালে কিছু পরিমাণে সভ্য ছিলেন।

বেদ সকল এক সময়ে রচিত হয় নাই, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ঋষিকর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে। সমুদয় বেদের মধ্যে ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, এবং অথর্ব্ব সর্ব্বা-পেক্ষা নব্য। (মহামুনি দ্বৈপায়ন সমুদয় বেদকে ঋক, যজু, সাম ও অথর্ব্ব এই চারিভাগে বিভক্ত করিয়া বেদব্যাস উপাধি প্রাপ্ত হন। পণ্ডিতবর কোলব্রুক সাহেব অনুমান করেন, তিনি খৃষ্টীয় শকের পূর্ব্বে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে প্রাদু-র্ভূত হইয়াছিলেন।)

আর্য্যেরা এদেশে পদার্পণ করা অবধি আদিমবাসীদিগের সহিত সমরকার্য্যে ব্যাপৃত হন। তাঁহারা স্বভাবতঃ ধর্ম্মপরা-য়ণ ছিলেন, কিন্তু নিরন্তর যুদ্ধকার্য্যে রত থাকিতে গেলে,যাগ যজ্ঞের লোপাপত্তি হইতে পারে, এই নিমিত্ত স্ব স্ব প্রতিনিধি স্বরূপ পুরোহিত নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের রাজত্ব যত ফেলাও হইতে লাগিল, তাঁহারা তত দূরদেশে যুদ্ধযাত্রা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দূরদেশে গতিবিধি করিতে গেলে অধিককাল বাসস্থান হইতে তফাৎ থাকিতে

হয়, সুতরাং পরিবার ভরণার্থ চাস বাস করা বৃদ্ধ হইয়া পড়ে। অতএব অবিলম্বেই এরূপ ঘটিয়া উঠিল যে,যাহারা যুদ্ধকার্য্যে তাদৃশ পটু নয়, তাহারা বাটীতে থাকিয়া কৃষি ও পশুপালন কর্ম্মে নিযুক্ত হইল*। এইরূপে কালক্রমে একই আর্য্যজাতি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন। পরিশেষে, আর এক জাতির সৃষ্টি হইল। ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া যে সকল বন্দী ধরিয়া আনিতে লাগিলেন, তাহারা শূদ্রনামে এক স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত হইল। প্রভুর সেবা ও আজ্ঞাপালন তাহাদের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল।

সমাজের প্রথম অবস্থায় এরূপ ঘটে যে, যাহার হস্তে অস্ত্রবল ও সৈন্যবল থাকে, সেই রাজ্যের অধীশ্বর হয়। সুতরাং ক্ষত্রিয়েরা ভিন্ন ভিন্ন জনপদ জয় করিয়া আপনার আপনার আধিপত্য স্থাপন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণেরা তখনও এত নিবীর্য্য হইয়া পড়েন নাই যে,বিনাবাধায় ক্ষত্রিয় জাতিকে সমুদয় রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য আত্মসাৎ করিতে দিবেন। অতএব এই সূত্রে দুই দলে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধবিদ্যায় অতিশয় নিপুণ ছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা অনভ্যাসবশতঃ তাদৃশ পটু ছিলেন না। তথাপি ব্যাপককাল এই বিরোধ চলিল। পরিশেষে ব্রাহ্মণেরা পরাস্ত হইলেন। ভৃগুনন্দন পরশুরাম ও ক্ষত্রিয়রাজগণের মধ্যে যে দন্দ্বের বিষয় পুরাণে বর্ণিত আছে,উহা হইতেই উক্ত

---

* কৃষি আর্য্যজাতির আদিম ও প্রাধ্যব্যবসায়। কারণ, আর্য্যশব্দটী "ঋ"ধাতু হইতে সাধিত। মক্ষমূলর বলেন ঋ ধাতুর অর্থ হলকার্য্য করা।

ঘটনাটি অনুমান করা যায়। কথিত আছে,মহাবীর পরশুরাম একবিংশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেন। পরে কশ্যপমুনির সান্ত্বনায় ক্ষান্ত হইয়া, তাঁহাকে সমস্ত ভূমণ্ডল প্রদানপূর্ব্বক, মহেন্দ্রপর্ব্বতে প্রস্থান করেন। পৃথিবী ক্ষত্রিয়শূন্য হওয়াতে নানা অনর্থের সম্ভাবনা দেখিয়া, ব্রাহ্মণেরা নিজ ঔরসে ক্ষত্রিয়পত্নীদের গর্ভে পুনর্ব্বার ক্ষত্রিয় জাতির সৃষ্টি করিতে যত্নবান হন। এই উপন্যাসটি যে ব্রাহ্মণ গ্রন্থকারদিগের স্বকপোলকল্পিত, তাহাতে দ্বৈধ নাই। কারণ, পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া হইলে,সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের রাজাবলী কখন অবিচ্ছিন্ন থাকিত না; প্রত্যুত পরশুরাম কর্ত্তৃক এই দুই বংশ নির্মূল হইলে পর ব্রাহ্মণেরা উহাদের রক্ষা করিয়াছিলেন, এরূপ বর্ণনা কোন না কোন পুরাণে অবশ্যই পাওয়া যাইত!

যদিও ব্রাহ্মণেরা ভুজবলে ক্ষত্রিয়দিগের নিকট পরাজিত হইলেন, তাঁহারা অন্যপ্রকারে আপনাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা তপোবল ও বিদ্যাবল অবলম্বন করিয়া স্বজাতির প্রাধান্য বিস্তার করিতে তৎপর হইলেন। কালসহকারে তাঁহাদের এরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিল, যে মহারাজ চক্রবর্ত্তীগণ তাঁহাদের পদানত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা ভূদেব বলিয়া গণ্য হইতে লাগিলেন, এবং এরূপ বাক্সিদ্ধ যে, তাঁহাদের বরে বন্ধ্যার পুত্র হইত, বিকলাঙ্গ সুন্দররূপ ধারণ করিত, মানুষে দিব্য চক্ষু পাইত, লোকে সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারিত, এবং সকলের আয়ু, ধন, জয় ও যশোলাভ হইত। পক্ষান্তরে তাঁহাদের অভিসম্পাতে মানুষ পাষাণ হইত, সকল দ্রব্য ভস্মসাৎ

হইতে পারিত, লোকে প্রিয়বস্তু বিস্মৃত হইয়া যাইত, রাজা-রও অকাল মৃত্যু ঘটিত। অধিক কি ব্রাহ্মণের কোপে সর্ব্বনাশ ও চিরকাল ঘোরনরকে নিবাস হইত। ক্ষত্রিয়েরা রাজ্যেশ্বর হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা ব্রাহ্মণ আমাত্যগণের উপদেশ ও অনুমতি ব্যতীত শাসন কার্য্য সমাধা করিতে পারিতেন না। ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতা যে কেবল মর্ত্তালোকে খাটিত এমন নহে, স্বর্গের দেবতারা পর্য্যন্ত তাঁহাদের ভয়ে সর্ব্বদা জড়সড় থাকিতেন। দেবরাজ ইন্দ্র গৌতমের শাপে একে-বারে রূপভ্রষ্ট হন, ধর্ম্মরাজ যম মাণ্ডব্যের শাপে পৃথিবীতে আসিয়া শূদ্রার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, দ্বিজরাজ চন্দ্র বৃহ-স্পতির অভিসম্পাতে চিরকালের জন্য কলঙ্ক প্রাপ্ত হন। অধিক কি. ভগবান স্বয়ং ভৃগুমুনির চরণচিহ্ন বক্ষঃস্থলে ধারণপূর্ব্বক তাঁহার কোপের শান্তি করেন। সমুদায় শাস্ত্রই ব্রাহ্মণদের হস্তে। সুতরাং সকল স্থলেই যে তাঁহাদের মাহাত্ম্য ও প্রভাবের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাইবে,উহার বিচিত্র কি? মনুসংহিতা এই বিষয়ের দৃষ্টান্ত স্থল।

মনুসংহিতা যে কোন সময়ে সঙ্কলিত হইয়াছিল, উহা নিরূপণ করা দুষ্কর। সর উইলিয়ম জোন্স অনুমান্ করেন, যে মনু খৃষ্টের পূর্ব্ব নবমশতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এই গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তৎকালে আর্য্যসমাজে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে এবং জাতিবিভাগ রীতিমত স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু মনুর সময়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ও বৈশ্য এই তিন জাতির মধ্যে উত্তম জাতীয় অধম জাতীয়ের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিত এবং পরস্পরের অন্নগ্রহণ দূষ্য বলিয়া

বিবেচিত হইত না। আরও জানা যায় যে, শাসনপ্রণালী শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে এবং আচার ব্যবহার বিষয়ে বিধি ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছে। যে সকল দেবতার কথা বেদে উল্লিখিত, মনুও তাঁহাদের অর্চ্চনার বিধি দিয়াছেন। বিষ্ণু, শিব ও তাঁহাদের অবতার রাম, কৃষ্ণ, হনুমান প্রভৃতির উল্লেখও করেন নাই। মনুর গ্রন্থে সহমরণের বিন্দুবিসর্গ কিছুই নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। পতির পরলোক হইলে, নারীগণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া জীবন কাটাইবেন, এরূপ আদিষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, মনুসংহিতার প্রধান দোষ এই যে, ইহাতে ব্রাহ্মণজাতির যৎপরোনাস্তি মাহাত্ম্য ও শূদ্রজাতির যৎপরোনাস্তি নীচতা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

মনুসংহিতার অব্যবহিত পরেই রামায়ণের উল্লেখ করা উচিত। এই গ্রন্থ বাল্মীকি ঋষির প্রণীত। ইহাতে সূর্য্যবংশাবতংস মহারাজ রামচন্দ্রের চরিত কীর্ত্তিত হইয়াছে। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে,বিটুরনগরের সন্নিকটে বাল্মীকির আশ্রম ছিল। কোন্ সময়ে যে তিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, উহার নিশ্চয় হয় না। যাহা হউক, তিনি যে মনুর অনেক পরে ও চন্দ্রগুপ্তের অনেক পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। মহাভারত আর একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইহাতে চন্দ্রবংশের অগ্রগণ্য কুরুপাণ্ডবদিগের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। রাজা যুধিষ্ঠিরের এক অব্দ প্রচলিত ছিল। তদনুসারে ৪৯৬৬ বৎসর পূর্ব্বে তিনি দিল্লীর নিকটবর্ত্তী ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কথিত আছে, ভারতের রচয়িতা ব্যাসদেব পাণ্ডবদিগের সমকালবর্ত্তী ছিলেন।

কিন্তু ইহা অসম্ভব, কারণ কোন গ্রন্থকার একজন সমকাল-বর্ত্তী লোককে দেবতা বলিয়া বর্ণন করেন না, এবং বর্ণন করিলেও জনসমাজে আদৃত হন না।

এইরূপে ব্রাহ্মণেরা সমুদায় জ্ঞানোপদেশও ধর্ম্মোপদেশ একচেটিয়া করিয়া লইলেন, এবং শূদ্রজাতিকে একবারে শাস্ত্রজ্ঞান হইতে বঞ্চিত করিলেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির বেদাধ্যয়নে অধিকার রহিল বটে, কিন্তু উহা কেবল নামমাত্র অধিকার; ব্রাহ্মণদিগের এই আশঙ্কা ছিল, অপরে জ্ঞান-লাভে অধিকারী হইলে, তাঁহাদের প্রাধান্যের লোপ হই-বেক। এ আশঙ্কা কোন মতে অমূলক নহে। কিন্তু আপা-ততঃ ইহার কোন কারণ লক্ষিত হইল না। ব্রাহ্মণেরা বহু-কাল একাধিপত্য করিয়া কাটাইলেন। পরিশেষে এক নূতন দিক হইতে বিপদ উপস্থিত হইল।

অধুনা যেখানে নেপাল প্রদেশ রহিয়াছে, পূর্ব্বে সেইস্থলে কপিলবাস্তু নামে একটী ক্ষুদ্র ক্ষত্রিয় রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। শাক্য সিংহ, যিনি পরে বুদ্ধ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন, তিনি সেই কপিলবাস্তুর রাজপুত্র। রোগ, জরা ও মৃত্যু যন্ত্রণায় জগৎ সংসার ব্যাপ্ত রহিয়াছে দেখিয়া, যৌবনাবস্থাতেই প্রিয়তমা যশোধারা ও পিতার প্রাসাদ পরিত্যাগ করিলেন, এবং নির্ব্বাণের পথ অনুসন্ধান করিবার জন্য কিছুকাল প্রগাঢ় সমাধিতে * নিমগ্ন হইলেন। পরে তাঁহার এই সিদ্ধান্ত হইল, যে কেবল সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান অর্থাৎ সত্য, সরলতা, মৈত্রী, দয়া প্রভৃতি ধর্ম্মের অনুশীলনদ্বারাই জীব সংসারদুঃখ হইতে পরিত্রাণ পায়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা যে বলেন তপস্যা, বলি-

* সমাধি—ধর্ম্মচিন্তা।

দান, যাগ যজ্ঞ ও হোম পূজা দ্বারা মুক্তিলাভ হয়, উহা অলীক। আর তত্ত্বজ্ঞানীরা যে সিদ্ধান্ত করেন, কেবল জ্ঞান দ্বারাই মোক্ষ প্রাপ্তি হয়, উহা ভ্রমমাত্র। (বুদ্ধ বলেন, কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণ মনুষ্যের দুঃখের কারণ; অতএব সমাধিবলে এইসকল রিপুকে নির্মূল করিতে পারিলেই পরিণামে নির্ব্বাণ প্রাপ্তি হয়) বেদ যে মনুষ্যকৃত নয় এবং সনাতনধর্ম্মের একমাত্র আকর, উহা তিনি স্বীকার করিতেন না। বুদ্ধদেব জাতিভেদ এককালে উঠাইয়া দিয়া এই নিয়ম করিলেন, যে শাস্ত্রচর্চ্চা করিতে সকলেরই সমান অধিকার আছে। কেবল পুরোহিতেরা বিবাহ করিতে পারিবেন না; তাঁহাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে, গৃহস্থাশ্রম হইতে কোন সুযোগ্য ব্যক্তিকে তৎপদে মনোনীত করা হইবেক।

শাক্যসিংহ স্বধর্ম্মপ্রচার করিবার নিমিত্ত প্রথমে কাশীধামে গমন করিলেন। তথায় অনেকে তাঁহার শিষ্য হইল। পরে মগধ রাজ্যের ভূপাল বিম্বিসার ও তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু, এবং কোশলরাজ্যের রাজা তাঁহার মতে আসিলেন। অনন্তর তিনি কপিলবাস্তুতে গমনপূর্ব্বক স্ববংশীয় সমুদায় ব্যক্তিকে ক্রমে ক্রমে নিজধর্ম্ম অবলম্বন করাইলেন।এখন বুদ্ধদেবের প্রাচীন অবস্থা। তাঁহার বয়ক্রম প্রায় সত্তর বৎসর। তিনি একদা কুশীনগরীর সন্নিকটে একটী শালবৃক্ষের তলে যেমন বিশ্রাম করিতে বসিলেন, অমনি মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তাঁহার শিষ্যেরা বলেন যে, তিনি এইরূপে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। অনেকে অনুমান করেন, খৃষ্টের পূর্ব্বে ৫৫০ অব্দে বুদ্ধদেবের মৃত্যু হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভারতবর্ষের আদিম রাজাগুলির বিবরণ।

অজাতশত্রুর পর চারিজন ভূপতি ক্রমান্বয়ে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অজাতশত্রুর কিছুকাল পরে পারস্যরাজ ডেরায়স ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন ও সিন্ধুনদের উভয় তীরস্থিত কয়েকটি জনপদ স্ববশে আনেন (৫২১ খৃঃ পূঃ)। এই আক্রমণ সম্বন্ধে কোন বিশেষবিবরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু এই অনুমিত হয়, ভারতবর্ষে, তাঁহার যে অধিকার ছিল, উহা বড় অল্প নয়; কারণ. এদেশ হইতে যে কর আদায় হইত, উহা তাঁহার বহুবিস্তৃত রাজ্যের সমুদায় রাজস্বের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ হইবেক।

খৃষ্টের পূর্ব্বে পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে শূদ্রবংশীয় নন্দ-রাজ মগধের সিংহাসন অধিকার করিয়া লন। নন্দ উপাধি-ধারী নয়জন রাজা একশত বৎসরকাল ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করেন। এই বংশের শেষ রাজার সময়ে মাসিডোনিয়ার অধিপতি মহাবীর আলেক্জাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন (৩২৭ খৃঃ পূঃ)। তিনি ইতিপূর্ব্বেই পারস্যরাজ্য জয় করিয়া-ছিলেন। আলেক্জাণ্ডার আটকনগরের নিকটে সিন্ধুনদ পার হইলেন। সিন্ধু ও বিতস্তার মধ্যবর্ত্তী যে জনপদ আছে, উহার অধিপতি রাজা তক্ষশীল সর্ব্বপ্রথম তাঁহার অধীনত্ব স্বীকার করিলেন। পরে তিনি বিতস্তা নদী পার হইয়া পুরুনামক এক জন প্রতাপশালী রাজার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। পুরু-

রাজ অতুল পরাক্রম প্রকাশ করিয়াও পরিশেষে পরাস্ত হইলেন।

আলেক্‌জাণ্ডরের এমনি উদারতা, যে শত্রুরও গুণগ্রহণে কিন্তু করিতেন না। অতএব তিনি পুরুরাজের পৌরুষ দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাকে নিজ রাজ্যপাটে পুনর্ব্বার স্থাপিত করিয়া, চন্দ্রভাগা ও ইরাবতী অতিক্রম পূর্ব্বক বিপাশার তীরে উপস্থিত হইলেন। সমৃদ্ধিশালী মগধরাজ্য পরাজয় করিবার জন্য তাঁহার অন্তঃকরণ হর্ষভরে নৃত্য করিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার সৈনিকগণ ক্রমাগত বার বৎসরকাল সমর ও প্রবাসের ক্লেশে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; এখন কোন মতে অগ্রসর হইতে রাজী হইল না। দিগ্বিজয়ী আলেক্‌জাণ্ডার অগত্যা ফিরিয়া চলিলেন, এবং সেনাপতি নিয়ার্কসকে জলপথে যাত্রা করিতে আদেশ করিয়া স্বয়ং বেলুচিস্থান দিয়া বেবিলন নগরে উপস্থিত হইলেন। অবিলম্বেই নিয়ার্কস সিন্ধুনদের মুখ হইতে পারস্য উপসাগর পর্য্যন্ত একটী জলপথ আবিষ্কার করিয়া প্রভুর নিকট আসিয়া পৌঁছিলেন। তখন আলেক্‌জাণ্ডার ভারতবর্ষের সঙ্গে ইউরোপের কিরূপে ব্যবসা বাণিজ্য চলিতে পারে, উহার উপায় দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার এরূপ মনও ছিল, যে অচিরকালমধ্যেই ভারতবর্ষ জয় করিতে পুনরায় অভিযান করিবেন। এমন সময়ে হঠাৎ জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মহৎ মতলব সকল লয় পাইয়া গেল।

আলেক্‌জাণ্ডারের মৃত্যুর পর, তাঁহার বিশাল রাজ্য তদীয়

সেনাপতিগণ আপনাদের মধ্যে বকরা করিয়া লইলেন। পারস্যরাজ্য সিলুকস নামক একজন প্রধান সেনাপতির হস্তে পড়িল। ঐ সময়ে চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের সাহায্যে নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া মগধের সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছিলেন। নন্দরাজের যে একজন নাপিত জাতীয়া পত্নী ছিলেন, তিনি তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বংশকে মৌর্য্যবংশ বলে। চন্দ্রগুপ্তের আমলে মগধরাজ্যের প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্য অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। তিনি সিলুকসের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন হইল। চন্দ্রগুপ্ত সিলুকসের কন্যাকে বিবাহ করিলেন এবং প্রতি বৎসর পঞ্চাশটি করিয়া হস্তী করস্বরূপ প্রদান করিতে সম্মত হওয়াতে, সিন্ধুনদের পূর্ব্বদিগস্থ সমুদায় জনপদ প্রাপ্ত হইলেন। মেগাস্থিনিষ সিলুকসের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্র নগরে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি ও অন্যান্য গ্রীসদেশীয় ইতিহাস লেখক হিন্দুজাতির তৎকালের আচার ব্যবহার বিষয়ে অনেক বর্ণনকরিয়া গিয়াছেন। এস্থলে কেবল উহার স্থুলবিবরণ লেখা যাইতেছে।

চন্দ্রগুপ্তের অধিকার যেমন বহুবিস্তৃত, তাঁহার প্রতাপ তেমনি দুর্দ্ধর্ষ ছিল। তথাপি তাঁহার রাজত্বকালে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এক শত আঠারটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত ছিল। ফলতঃ এই বিশাল ভারতভূমি আলাউদ্দিনের পূর্ব্বে কখনও এক রাজার অধীনস্থ হয় নাই। যখন যিনি সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হইতেন, তিনি মহারাজাধিরাজ, সার্ব্বভৌম প্রভৃতি উপাধি ধারণ করিতেন। চন্দ্রগুপ্তের সময়ে এদেশীয়

লোকেরা পূর্ব্ববৎ নানা জাতিতে বিভক্ত ছিলেন; কিন্তু আর্য্য ও দস্যু এই বলিয়া পূর্ব্বে যে প্রভেদ করা হইত; উহা একবারে অন্তর্হিত হইয়াছিল। তৎপরিবর্ত্তে দ্বিজ ও শূদ্র এই রূপে ইতরবিশেষ করা চলিত। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন আর্য্যজাতি দ্বিজনামে * নির্দ্দিষ্ট হয়; এবং কায়স্থ, সদ্গোপ প্রভৃতি নানাজাতি শূদ্রনামে পরিচিত হইয়া থাকে। শূদ্র জাতির মধ্যে যাহারা উচ্চ শ্রেণীস্থ, তাহারা আর্য্য ও আদিবাসী মিশ্রিত † হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে, এবং যাহারা নীচ, তাহারা কেবল আদিবাসীদের সন্তান; এই জন্য তাহাদের জল আচরণীয় নয়। যে সকল ব্রাহ্মণ তাহাদের যাজনক্রিয়া করেন, তাঁহারা পতিত বর্ণ ব্রাহ্মণ নামে উক্ত হন। এই প্রকার জাতিবিভাগ যেমন এখন, তেমনি চন্দ্রগুপ্তের সময়েও প্রচলিত ছিল। কিন্তু গ্রীসদেশীয় ইতিহাস লেখকেরা সকলে একবাক্য হইয়া বলেন,যে তৎকালে এদেশে কুৎসিত দাসত্ব প্রথা রহিত হইয়াছিল এবং সহমরণ প্রথা তাদৃশ প্রচলিত ছিল না। গ্রীকেরা ভারতবর্ষীয় যোগীদিগের কঠোর ব্রতানুষ্ঠান দেখিয়া বিস্মিত হন। কালনশ নামক একজন যোগী আলেক জাণ্ডারের সমভিব্যাহারে যান।

---

* দ্বিজ শব্দে যাহার দুইবার জন্ম হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের একবার মাতৃগর্ভে জন্ম, আবার গায়ত্রী উপদেশে জন্ম হয়।

† এই সকল জাতিকে বর্ণসঙ্কর বলে। বর্ণসঙ্কর দুই প্রকার, অনুলোমক্রমে ও প্রতিলোমক্রমে। পিতা উত্তমজাতীয় ও মাতা অধম জাতীয় হইলে অনুলোম বলে। এই সংসর্গে যে সন্তান জন্মে সে বাপের চেয়ে নীচে কিন্তু মায়ের চেয়ে ভদ্র হয়। যথা. বৈদ্য। ইহার বিপরীত হইলে প্রতিলোম বলে। প্রতিলোমজাত সন্তান অতি নীচ। যথা; গণ্ডা, চণ্ডাল প্রভৃতি।

তিনি পারস্য দেশে পৌঁছিয়া পীড়িত হইয়া পড়েন। চিকিৎসকেরা তাঁহার রোগশান্তির জন্য ঔষধ ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু তিনি উহা সেবন না করিয়া অকুণ্ঠিতচিত্তে জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ পূর্ব্বক দেহকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন।

এদেশের রাজারা গ্রীকদিগের যে সকল উপহার প্রদান করেন, তদ্দ্বারা বোধ হয় যে, তখন ভারতবর্ষের সৌভাগ্যের দশা ছিল। তৎকালে অনেকানেক সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগরে ও বন্দরে বিদেশস্থ বণিকেরা আসিয়া বাণিজ্য করিতেন। পুলিষের নিয়ম অতি সুন্দর ছিল এবং রাজা ও তাঁহার মন্ত্রিগণ সাবধান হইয়া বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। পল্লীসমাজ* সকল স্থানে স্থাপিত ছিল। গ্রীকেরা উহাদিগকে এক একটি ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্র বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। গ্রীকেরা বলেন তৎকালেও দর্শনশাস্ত্রের অনেক উন্নতি হইয়াছিল, কি স্থপতি বিদ্যা† ও সঙ্গীতশাস্ত্রের তাদৃশ

* পল্লীসমাজ—গ্রামের সমুদায় অধিবাসীরা দলবদ্ধ হইয়া থাকে। গ্রামের মণ্ডল সেই দলের অধিপতি। তিনি নিজ এলাকার মধ্যে শান্তিরক্ষণ, জমানিরূপণ, বিবাদ ভঞ্জন ও রাজস্ব আদায়ের জন্য দায়ী। তিনি রাজা ও প্রজা উভয়ের প্রতিনিধি স্বরূপ পরিগণিত হন। কোন প্রজা সমাজের অমতে, সমাজভুক্ত নয় এমন ব্যক্তিকে, নিজ জমিজমা দানবিক্রয় করিতে পারেনা। যদি কেহ উত্তরাধিকারী না রাখিয়া পরলোক গমন করে; তাহার বিষয় রাজার না হইয়া সমাজেরই দখলে আইসে। মণ্ডলের সাহায্যার্থ মুহুরি কোটাল প্রভৃতি কয়েক জন কর্ম্মচারী তাঁহার তাঁবে নিযুক্ত থাকে। পল্লীসমাজ অতি পূর্ব্বকাল হইতে এদেশের নানা স্থানে সন্নিবেশিত ছিল, কিন্তু এখন ইয়ুরোপীয় সভ্যতার প্রভাবে ক্রমশই বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে।

† স্থপতিবিদ্যা—গৃহাদিনির্ম্মাণ করিবার জ্ঞান।

ডাক সংখ্যা: 28870
পরিগ্রহণ সংখ্যা ২১
পরিগ্রহণের তারিখ 03/12/2007

চর্চ্চা হয়নাই। বর্ত্তমানে শিল্পবিদ্যার যেরূপ অবস্থা [illegible] প্রায় সেরূপ ছিল। যে প্রকার প্রণালীতে এখন কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ হয় এবং যে সকল ফসল এখন উৎপন্ন হইয়া থাকে, চন্দ্রগুপ্তের সময়েও তদ্রূপ দৃষ্ট হইয়াছিল।

আরও বর্ণিত আছে, যে তৎকালে পর্ব্বাহ উপলক্ষে খুব জাঁকজমক হইত। এদেশের লোকেরা সূক্ষ্ম ও শুভ্র ধুতি চাদর ব্যবহার করিতেন ও নানা রকমের চিক্কণ রঙ তৈয়ার করিতে পারিতেন। গ্রীকদিগের মতে এদেশের লোকেরা শাস্ত্রের অনুশীলনে অত্যন্ত অনুরক্ত, শান্তস্বভাব, মিতাহারী নেসাবর্জ্জিত, শঠতাশূন্য, ন্যায়পরায়ণ, ও আড়ম্বরবিহীন। তাঁহারা মোকদ্দমায় নিতান্ত অনিচ্ছুক ও সর্ব্বপ্রকারে সত্যবাদী ছিলেন। গ্রীকেরা আরও বলেন যে আসিয়ার যত জাতির সহিত তাঁহারা সংগ্রাম করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের লোকেরা সেই সকলের অপেক্ষা অধিক সাহসী। ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় যে, মনুর সময়ে এদেশীয় লোকের যেরূপ আচার ব্যবহার ছিল, চন্দ্রগুপ্তের আমলেও সেইরূপ। অধিক কি, উহা এখনও অনেক অংশে অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। যাহা হউক, গ্রীকেরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের রীতিনীতি ও অবস্থা সন্দর্শন করিয়া যে প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন, ইহা আমাদের পক্ষে শ্লাঘার বিষয় সন্দেহ নাই।

চন্দ্রগুপ্তের পর তাঁহার পুত্র বিন্দুসার মগধরাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অনন্তর খৃষ্টের পূর্ব্বে ২৬৩ অব্দে তৎপুত্র অশোক রাজপদে অভিষিক্ত হন। তাঁহার আর একটি নাম প্রিয়দর্শী। তিনি প্রায় চল্লিশ বৎসরকাল রাজত্ব

বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী

করেন। তাঁহার আমলে মগধরাজ্যের ঐশ্বর্য্যের চড়ান্ত হই- য়াছিল। হিন্দুস্থানের অনেকানেক ভূপাল তাঁহার বশতাপন্ন হন। পশ্চিমে পেশোয়ার, কাশ্মীর, ও সুরাট এবং পূর্ব্বে বাঙ্গালা, উড়িষ্যা ও তৈলঙ্গ এই সীমার অন্তঃপাতী সমুদায় দেশে তাঁহার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অশোকের দত্ত অনেক তাম্রফলক দিল্লী, এলাহাবাদ স্থান হইতে খুঁড়িয়া তোলা হইয়াছে। ঐ সকল তাম্রফলকে পালি ভাষায় যাহা যাহা লেখা আছে, তাহা হইতে তাঁহার আমলের ধর্ম্ম, রাজ্যশাসন ও বিচার সংক্রান্ত বিস্তর খপর পাওয়া গিয়াছে। অশোকের শাসনকালে বৌদ্ধধর্ম্ম রাজধর্ম্ম বলিয়া সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইয়াছিল। যাজকগণ উহার প্রচার জন্য নানা দেশে প্রস্থান করেন। অধিক কি রাজকুমার নিজে লঙ্কাদ্বীপে যাইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন।

অশোক-রাজের পর সাতজন ভূপতি খৃষ্টের পূর্ব্বে ১৯৫ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন, অবশেষে মৌর্য্যবংশের লোপ হয়। তৎপরে সঙ্গবংশ, কণ্ববংশ, ও অন্ধ্রবংশের রাজারা ক্রমান্বয়ে মগধরাজ্য শাসন করেন। সমুদায় প্রাচীন হিন্দু- রাজ্য মধ্যে মগধরাজ্যের প্রতাপ ও সমৃদ্ধি অত্যন্ত অধিক ছিল। তৎকালে সুপ্রশস্ত রাজপথ সকল পাটলিপুত্র হইতে সিন্ধু ও ভড়োচ নগর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। বিদ্যা ও বাণিজ্যের অনুশীলনার্থ লোকের সাতিশয় উৎসাহ বাড়িয়া- ছিল। মগধরাজ্যের প্রজারা ব্যবসার জন্য জাবা দ্বীপ পর্য্যন্ত যাতায়াত করিত। বোধ হয় তাহাদিগের সংস্রবেই তথাকার অধিবাসীরা হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। ঐদ্বীপের ইতি-

হাস লেখকেরা বলেন, খৃষ্টের পূর্ব্বে ৭৫ অব্দে তাহারা হিন্দু-ধর্ম্ম অবলম্বন করে। গত ৪ শত বৎসরের মধ্যে মুসলমানেরা উক্ত দ্বীপে গমন পূর্ব্বক হিন্দুজাতির আধিপত্য নষ্ট করিয়া নিজপ্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু উহার নিকটবর্ত্তী বালি-নামক দ্বীপে অদ্যাপি হিন্দুধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

মৌর্য্যবংশের বিলোপ হইতেই বৌদ্ধ ধর্ম্মের হ্রাস আরম্ভ হয়। পুরাণে বর্ণিত আছে, যে ঋষিগণ বিধর্ম্মীগণের বৃদ্ধি দেখিয়া ভীত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। লোকপিতামহ তাঁহাদিগকে এই আদেশ করেন, পরশুরাম যে ক্ষত্রিয়জাতির সংহার করিয়াছেন, তাহার পুনর্ব্বার সৃষ্টি করা আবশ্যক। তদনুসারে ঋষিরা মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক অগ্নিকুণ্ডে গঙ্গাজল প্রক্ষেপ করিলেন। তৎক্ষণাৎ চারি জন বীর পুরুষ তথা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন, এবং ঘোরতর যুদ্ধের পর বৌদ্ধরূপী রাক্ষসদিগের হস্ত হইতে ভারত ভূমিকে মুক্ত করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইঁহারাই অগ্নিকুল নামে খ্যাত। অনেকানেক রাজপুত ইঁহাদিগকে আদিপুরুষ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। এই গল্পটি যে, কোন বাস্তবিক ঘটনা হইতে উঠিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতে বোধ হয়, যে ভারত-বর্ষ হইতে বৌধর্ম্মকে তাড়াইয়া দিবার জন্য অনেক সংগ্রাম ও শোণিত বর্ষণ হইয়াছিল।

যে চারিটি অগ্নিকুলবংশের কথা উল্লেখ কর[illegible]ক প্রমরবংশ সেই সকলের মধ্যে প্রবল। মহারাজ বি[illegible]হা-সেই বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। মালবদেশের [illegible]খ্যাত। [illegible]ইনী নগরীতে তাঁহার রাজধানী ছিল। [illegible]গণও

অব্দে তিনি একটী শক স্থাপিত করেন, উহা সংবৎ নামে অদ্যাপি প্রচলিত রহিয়াছে। বিক্রমাদিত্য যেমন গুণগ্রাহী তেমনি বিদ্যার অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার নবরত্ন সভার অন্তর্গত কবি কালিদাস ভারতের ভূষণ ও শ্লাঘা স্বরূপ গণ্য হন। বিক্রমাদিত্য আর্য্যধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধির জন্য নিতান্ত যত্নবান্ ছিলেন। এই নিমিত্ত তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বিক্রমাদিত্যের পর মালবরাজ্যের বড় হীন অবস্থা হয়। অনন্তর বহুকাল পরে একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ভোজরাজ উক্ত রাজ্যের সিংহাসন কিছুদিনের জন্য উজ্জ্বল করেন। ধারানগরীতে তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি বিক্রমাদিত্যের ন্যায় বিদ্যার উৎসাহ ও পুরস্কার প্রদান-পূর্ব্বক আপনার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন।

খৃষ্টের দ্বিতীয় শতাব্দীতে গুপ্তবংশ কাণ্যকুব্জ রাজ্যে প্রভুত্ব স্থাপন করেন। এই বংশের রাজারা ব্রাহ্মধর্ম্মের পোষণার্থ বৌদ্ধদিগের প্রতি শত্রুতাচরণ করেন। ৪৭০ অব্দে রাহতর উপাধিধারী রাজপুতেরা গুপ্তবংশকে পরাজিত করিয়া কাণ্যকুব্জের সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহম্মদ ঘোরীর আক্রমণ পর্য্যন্ত তাঁহারা নিরাপদে ঐ রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। কাণ্যকুব্জ পূর্ব্বাবধি হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রধান আকর ছিল। ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে কৃতবিদ্য পণ্ডিতগণ ঐ নগরে উপস্থিত হইয়া রাজার নিকটে উপাধি প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতেন।

কাণ্যকুব্জের গুপ্তবংশীয় কোন পুরুষ ৩১৮ খৃঃ অব্দে গুজরাটে গিয়া প্রভুত্ব স্থাপন করেন। বল্লভী নগরীতে তাঁহার রাজধানী

ছিল। তাঁহার সন্তান সন্ততি ৭৪৬ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিলে পর, চৌর উপাধিধারী রাজপুত্রেরা গুজরাট রাজ্য আত্ম-সাৎ করেন। তাঁহারা ৯৩১ অব্দ পর্য্যন্ত এই প্রদেশে আধি-পত্য করেন। পরে চালুক্যবংশীয়েরা বিবাহসূত্রে উহার অধিকারী হন। কথিত আছে, চালুক্যেরা পাণ্ডবদিগের সন্তান; ২৫০ খৃঃ অব্দে অযোধ্যা হইতে আসিয়া আধুনিক নিজাম রাজ্যের পশ্চিমাংশে প্রভুত্ব স্থাপন করেন। চালুক্য-বংশের রাজারা তিনশত বৎসরকাল গুজরাটে রাজত্ব করেন। অনন্তর ১২৯৭ অব্দে সুবিখ্যাত আলাউদ্দিন এই রাজ্য অধি-কার করিয়া লন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইতে মুসলমানদিগের আক্রমণ পর্য্যন্ত বাঙ্গালাদেশে পাঁচটি রাজবংশ ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করে। তন্মধ্যে তৃতীয় রাজবংশের রাজধানী প্রথমতঃ গৌড়নগরে তৎপরে নবদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই বংশের ভূপতিগণ পাল নামে খ্যাত। পালবংশের পর এক ক্ষত্রিয়বংশ বঙ্গ-রাজ্যের আধিপত্য প্রাপ্ত হন। আদিসুর এইবংশে জন্ম-গ্রহণ করেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে আদিসুর এই দেশের ব্রাহ্মণদিগকে যাগযজ্ঞ করাইতে অক্ষম দেখিয়া, ৯৯৯ শকে অর্থাৎ ১০৭৭ খৃঃ অব্দে কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আন-য়ন করেন এবং তাঁহাদিগকে পাঁচ খানি গ্রাম প্রদান পূর্ব্বক এই দেশে বসতি করান। তাঁহারা প্রত্যেকে এই দেশীয় এক একটি ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ করিলেন। উহাদের গর্ভে তাঁহা-দের যে সন্তান সন্ততি জন্মে, উহারা বারেন্দ্র নামে খ্যাত। কিছু কাল পরে পাঁচ জন ব্রাহ্মণের পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীগণও

তাঁহাদের গর্ভজাত সন্তানদিগকে লইয়া নিজ নিজ স্বামীর নিকট উপস্থিত হইলেন। উঁহারা রাঢ়ী নামে এক পৃথক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। যখন পাঁচ জন ব্রাহ্মণ এদেশে প্রথম আগমন করেন,তাঁহাদের সঙ্গে পাঁচটি কায়স্থ ভৃত্য আইসে। জনশ্রুতি অনুসারে তাহারা আধুনিক কুলীন কায়স্থগণের আদিপুরুষ। যাহা হউক, উক্ত উপাখ্যান হইতে ইহা অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে যে, আদিস্থরের সময়ে উত্তরপশ্চিম অঞ্চল হইতে অনেক লোক বঙ্গদেশে আসিয়া বসতি করিয়াছিল। কালক্রমে আদিস্থরের বংশধ্বংস হইল। সেন বংশীয় রাজারা গৌড়দেশের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। এই বংশের সুপ্রসিদ্ধ রাজা বল্লালসেন কৌলিন্য মর্য্যাদা স্থাপন করেন। সেন বংশের শেষ রাজা লক্ষ্মণসেন। তাঁহার অধিকার কালে ১২০৩ অব্দে মুসলমানেরা বঙ্গদেশ জয় করেন।

দাক্ষিণাত্যের মধ্যে পাণ্ড্যরাজ্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। জনশ্রুতি এই, খৃষ্টের পূর্ব্বে পঞ্চমশতাব্দীতে পাণ্ড্য নামে এক জন বৈশ্য, অযোধ্যা হইতে আসিয়া ঐ রাজ্যটি স্থাপন করেন। মদুরা উহার রাজধানী। এই বংশীয় একজন রাজা রোমের সম্রাট আগষ্টসের নিকট পর্য্যন্ত দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। পাণ্ড্যবংশ ধ্বংস হইলে, নায়ক উপাধিধারী ভূপতিগণ মদুরার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। অবশেষে ১৭৩৬ অব্দে তাঁহারা আর্কটের নবাবের বশ্যতাপন্ন হন।

দাক্ষিণাত্যের আর একটি প্রাচীন রাজ্যের নাম চল। খৃষ্টে পূর্ব্বে ৩৫০ ও ২১৪ অব্দের মধ্যে তয়ামান নাল নামক

এক ব্যক্তি হিন্দুস্থান হইতে আসিয়া ঐ রাজ্যটী স্থাপন করেন। উহার রাজধানী কাঞ্চীপুর নগরে প্রথমতঃ স্থাপিত হয়, পরে তঞ্জোর নগরে অপসারিত হইয়া বোধ হয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীপর্য্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল। অনন্তর চলরাজ্য কিছুকাল বিজয়নগরের অধীনে থাকিয়া মহারাষ্ট্রাদের বশতাপন্ন হইয়া যায়।

মলবার, ত্রিবাঙ্কোড ও মহীশূরের পশ্চিমভাগ খৃষ্টীয় শকের প্রথম শতাব্দী হইতে চের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নবম শতাব্দীতে ঐ রাজ্যের দক্ষিণ অঞ্চল কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। উহাদের মধ্যে কালিকট নামক প্রদেশটি জামরিণ উপাধিধারী রাজবংশ কর্তৃক বহুকাল শাসিত হইয়া, অবশেষে ১৭৬৬ অব্দে হায়দর আলির অধিকারভুক্ত হয়। চেররাজ্যের উত্তরাংশ বল্লাল নামক এক রাজপুতবংশের হস্তে পতিত হয়। তাঁহারা বিলক্ষণ বীর্য্যসম্পন্ন ছিলেন। মহীশূরের উত্তরে দ্বারসমুদ্র নামে যে একটী নগর ছিল, উহাই তাঁহাদের রাজধানী। ১৩১০ অব্দে মুসলমানেরা এই রাজ্যটিকে আত্মসাৎ করেন।

শালিবাহন নামে এক ব্যক্তি গোদাবরীর তীরে পাটন নগরে আপনার প্রভুত্ব স্থাপন করেন। কথিত আছে, তিনি জাতিতে কুমর; রাজবিদ্রোহী হইয়া রাজ্যেশ্বর হইয়া উঠেন। খৃষ্টের ৭৭ অব্দে তিনি একটী শক প্রচলিত করিয়া দেন। তাহার নাম শকাব্দা। শকাদিত্য অত্যন্ত দ্বিজভক্ত ছিলেন; বৌদ্ধদিগের বিপক্ষতাচরণ হইতে সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতেন।

প্রতাপশালী অন্ধ্র বংশের একটী শাখার প্রভুত্ব বরঙ্গল নামক নগরে স্থাপিত হয়। উহা আধুনিক নিজাম রাজ্যের রাজধানী হায়দারাবাদের প্রায় আশি মাইল পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৩২৩ অব্দে মুসলমানেরা উক্ত নগর অধিকার করিয়া লয়, কিন্তু শীঘ্র পরাস্থ হইয়া তথা হইতে পলায়ন করে। এই রাজ্যের রাজারা বরাবর বামনি উপাধিধারী মুসলমান ভূপতিগণের সহিত বিরোধে বিব্রত ছিলেন। অবশেষে ১৪৩৪ খৃঃ অব্দে আহম্মদ সাহ বরঙ্গল নগর ভূমিসাৎ করিয়া ফেলেন।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মৌর্য্যবংশের ক্ষয় হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের অবসাদ আরম্ভ হয়, এবং ব্রাহ্মণেরা বিক্রমাদিত্য ও শকাদিত্যের সাহায্য পাইয়া উৎসাহযুক্ত হইয়া উঠেন। মালবের রাজমন্ত্রী মহামহোপাধ্যায় কুমারিলভট্ট বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিপক্ষে অভ্যুত্থান করেন। লোকে বলে তিনি কার্ত্তিকেয়ের অবতার, বোধ হয় খৃষ্টের পঞ্চম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কুমারিলভট্ট যুক্তি বলে ও অস্ত্রবলে বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মের প্রতি আঘাত করিবার জন্য সবিশেষ প্রয়াস পান। ৭ম শতাব্দীর মাঝামাঝি চিনদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী হিওয়েন সাঙ কাশ্মীর হইতে কাঞ্চী পর্য্যন্ত তাবৎ দেশ পর্য্যটন করেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, কাশ্মীর, প্রয়াগ, ও উজ্জয়িনী রাজ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু মগধরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম পূর্ব্বের ন্যায় প্রবল রহিয়াছে এবং কান্যকুব্জ, মালব ও মহারাষ্ট্রদেশে রাজার উৎসাহের জোরে তখনও অবসন্ন হইয়া পড়ে নাই। অনন্তর

অষ্টম ও নবম শতাব্দীর সন্ধিতে মহামহোপাধ্যায় শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। লোকে বলে তিনি দেবাধিদেব মহাদেবের অবতার। তিনি ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র দিগ্বিজয় করিয়া বেড়ান, অর্থাৎ অকাট্য যুক্তিবলে বেদান্তের মত সংস্থাপনপূর্ব্বক বৌদ্ধধর্ম্মকে অলীক বলিয়া প্রমাণ করত নানাদেশ পর্য্যটন করেন। এইসময় হইতেই বৌদ্ধেরা ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং ভারতভূমি ছাড়িয়া, বর্ম্মা, চিন, তিব্বত প্রভৃতি দেশে আশ্রয় লইতে আরম্ভ করে। তথাপি তাহাদিগের ক্ষমতার চিহ্ন ভারতবর্ষের উত্তর খণ্ডের অনেক প্রদেশে দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব দশম শতাব্দী অতীত না হইলে কাশী রাজ্য হইতে, ও একাদশ শতাব্দী গত না হইলে মহারাষ্ট্র দেশ হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। অধুনা এই ধর্ম্ম, বর্ম্মা, শ্যাম, সিংহল, চিন, তিব্বত, তাতার প্রভৃতি দেশে প্রবল রহিয়াছে। পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম্ম আছে, বৌদ্ধধর্ম্মের লোক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মুসলমান ধর্ম্মের উৎপত্তি ও প্রাদুর্ভাব।

আরবদেশ পাহাড় ও মরুভূমিতে পরিপূর্ণ। এই জন্য তথাকার অধিবাসীরা নিতান্ত সাহসী, কষ্টসহ ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। আরবেরা প্রথমে নানা দেবদেবীর উপাসনা করিত ও নিজধর্ম্মের প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিল। তাহারা নানা জাতিতে বিভক্ত ছিল, এবং নিরন্তর পরস্পর বিরোধে প্রবৃত্ত হইয়া সকল বিষয়ে হুলস্থুল করিয়া তুলিত। এই নিমিত্ত বোধ হয়, আরবাদিগের মধ্যে সমাজ ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নিয়ম সকল তৎকালে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলনা। যখন আরবদেশের এইরূপ অবস্থা, তখন মহম্মদ মক্কার অদূরে হিরা নামক পর্ব্বতের কন্দরে বসিয়া প্রগাঢ় সমাধিতে নিমগ্ন-ছিলেন। ক্রমে তাঁহার মনে এই প্রধান সিদ্ধান্তটি হইল, "যে নানা দেবদেবী কল্পনা বিড়ম্বনা মাত্র; ঈশ্বর নিরাকার ও অদ্বিতীয়। আমি তদীয় সত্য ধর্ম্ম ও উপাসনা প্রচার করিবার নিমিত্ত তাঁহার আদেশে অবনীতে অবতীর্ণ হই-য়াছি। আমি যে তাঁহার নিকট হইতে কোরাণ নামক এক খানি গ্রন্থ পাইয়াছি উহাতে সমুদয় জ্ঞাতব্য বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে। "মহম্মদ নিজধর্ম্ম প্রকাশ্যরূপে আলোচনা করি-বার উপক্রম করিতে না করিতেই চতুর্দ্দিগ হইতে আপত্তি

উত্থাপিত হইতে লাগিল। তথাপি তিনি নানা যন্ত্রণা ও অবমাননা সহ্য করিয়াও স্বমত প্রচার করিতে লাগিলেন, কিন্তু পরিশেষে মক্কার কর্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহার প্রাণনাশের জন্য চক্রান্ত করিতেছেন দেখিয়া ঐ স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক মদিনায় পলায়ন করিলেন।* অবিলম্বেই অনেকে তাঁহার মত অবলম্বন করিতে লাগিল ও তাঁহার রক্ষার্থ দৃঢ়তর হইল। পূর্ব্বে মহম্মদ অতি নিরীহলোক ছিলেন। কিন্তু অধুনা শত্রুর অত্যাচারে অধীর হইয়া স্বদলের মধ্যে এই নূতন মত প্রচার করিতে লাগিলেন যে, "যে ব্যক্তি আমার ধর্ম্মে না আসিবে, তাহাকে সমূলে সংহার কর; তোমরা পরকালে অতুল সম্পদ লাভ করিবে।" মহম্মদের মদিনায় আসিবার দশবৎসরের মধ্যে সমস্ত আরবদেশে তাঁহার ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইল। অনন্তর আরবেরা অশ্রুতপূর্ব্ব রণমদে উদ্দীপ্ত হইয়া স্বধর্ম্ম প্রচারার্থ দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিল। অল্পকালের মধ্যেই মিসর, সিরিয়া, পারস্য, তুর্কস্থান ও কাবুল তাহাদের অধীনস্থ হইল। ক্রমে তাহাদের প্রভুত্ব আফ্রিকা ও স্পেন দেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইল। কিন্তু তাহারা ভারতবর্ষজয়ের জন্য প্রায় একশত বৎসর প্রয়াস পাইয়াও কৃতকার্য্য হয় নাই। কারণ তখনও হিন্দুজাতি এখনকার মত নিবীর্য্য হইয়া পড়ে নাই এবং তাহাদের স্বীয় ধর্ম্মের প্রতি এমনি প্রগাঢ় ভক্তি, যে উহা কিছুতেই বিচলিত হইবার নহে। অনন্তর

* মদিনায় পলায়ন খৃষ্টের ৬২২অব্দে ঘটে। এই ঘটনা হইতে মহম্মদের সাল প্রচলিত হয়। উহাকে হিজারা বলে।

মহম্মদ কাসিম ৭১১ খৃঃ অব্দে একদল আরবীয় সৈন্য লইয়া সিন্ধুদেশে অবতীর্ণ হইলেন। সিন্ধুরাজ্যের রাজা ডাহির ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া রণশায়ী হইলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী রাজধানী রক্ষার্থ বহুতর প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু পরিশেষে সকল বিষয়ে বিফলপ্রযত্ন হইয়া, সপরিবারে জ্বলন্ত অনলে আত্ম সমর্পণ করিলেন। সিন্ধুরাজ্য সর্ব্বতোভাবে কাসিমের বশীভূত হইল। কিন্তু তথায় মুসলমানদিগের আধিপত্য বহুকাল স্থায়ী হয় নাই। ৭৫০ খৃঃ অব্দে সুমরবংশীয় রাজপুতেরা তাহাদের বিপক্ষে অভ্যুত্থান করিল, মুসলমানেরা ভারতভূমি হইতে তাড়িত হইয়া গেল এবং সিন্ধুরাজ্য পুনরায় হিন্দুদের হস্তগত হইল। ইহার পর ২৩০ বৎসর কাল হিন্দুরা নিরুদ্বেগে কালযাপন করেন। অনন্তর সলিমান পর্ব্বতের অভ্যন্তর হইতে এক নূতন উৎপাত উপস্থিত হইল।

খৃষ্টের দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে সামনি নামে একটি মুসলমানবংশ আসিয়ার মধ্য প্রদেশে প্রভুত্ব স্থাপন করেন। বুখারা নগরীতে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। সামনিবংশীয় পঞ্চম রাজা আবদুলমুল্লক; তাঁহার আলপ্তগিন নামে একজন ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি নিজ সুবুদ্ধি, সাহস ও সাধুতাগুণে প্রভুর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন, এবং ক্রমে খোরাসান বিভাগে শাসনকর্তৃত্ব পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইলেন। ৯৬১ অব্দে আবদুল মুল্লকের পরলোক হইলে, আলপ্তগিন পদচ্যুত ও মহাসঙ্কটে পতিত হইলেন। তখন তিনি অন্য উপায় না দেখিয়া নিজ দলবলের সহিত গজনী নগরীতে আসিয়া আশ্রয় লইলেন; এবং উহার চতুর্দ্দিগস্থ জনপদ

নিজ অধিকারভুক্ত করিতে লাগিলেন। এই রূপে আলপ্তগিন চৌদ্দবৎসরকাল প্রভুত্ব করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র ইষাক একবৎসরমাত্র রাজত্ব করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইলেন। সাবক্তগিন নামে এক ব্যক্তি আলপ্তগিনের ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি প্রভুর বিশ্বাসভাজন হইয়া ক্রমশঃ উচ্চ উচ্চ পদে আরোহণ করিয়াছিলেন। এখন গজনীর সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া আলপ্তগিনের কন্যাকে বিবাহ করিলেন (৯৭৭)। সাবক্তগিন গজনি-বীরবংশের স্থাপয়িতা। তিনি ক্রমে আফগানিস্থান, বেলুচি-স্থান ও তুর্কস্থান নিজরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন।

এত নিকটে একটি নূতন যবনরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল, দেখিয়া পঞ্জাবের অধিপতি জয়পাল বিলক্ষণ শঙ্কিত হই-লেন, এবং একদল ফৌজ লইয়া পেশোয়ারের অদূরে শত্রুকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে দমন করিতে সমর্থ হইলেন না। অতঃপর সাবক্তগিন বৈরনির্যাতনার্থ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। জয়পালও দিল্লী, আজমীর, কানাকুব্জ ও কালিঞ্জরের ভূপতিদিগের সহিত মিলিত হইয়া অগ্রসর হইলেন। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলেন। উক্ত ঘটনার কিছু দিন পরে, ৯৯৬ অব্দে তাঁহার পরম শত্রু গজনীরাজ সংসারযাত্রা সম্বরণ করিলেন।

সাবক্তগিনের দুই পুত্র, মামুদ ও ইস্মেল; রাজ্যের অধিকার লইয়া দুই ভাইয়েতে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইল। কিন্তু মামুদ নিজ নৈপুণ্যে ভ্রাতাকে পরাস্ত করিয়া সিংহা-সনে অধিরোহণ করিলেন। ইস্মেল কারারুদ্ধ হইলেন, কিন্তু

তাঁহার কারাবাসের ক্লেশ পরিহার করিবার জন্য, মামুদ তাঁহার প্রতি সতত সদয় ব্যবহার করিতেন।

মামুদ প্রথম চারিবৎসরকাল নিজরাজ্যের দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ অতিবাহিত করিলেন, পরে ভারতবর্ষের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি স্বভাবতঃ মুসলমান ধর্ম্মের গোঁড়া ছিলেন; সম্প্রতি খালিফ হইতে সম্মানসূচক খিলাত ও উপাধি প্রাপ্ত হওয়াতে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষভাব আরও প্রবল হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষের সমৃদ্ধি দেখিয়া তাঁহার মনে বড় লোভ জন্মিয়াছিল, এখন সেই ধনতৃষ্ণা চরিতার্থ করিবার জন্য উৎসুক হইলেন। তিনি তাঁহার পিতার যুদ্ধকালে জানিয়াছিলেন যে, হিন্দুযোধগণ যদিও সাহস ও বিক্রমবিহীন নয়, তথাপি শৃঙ্খলা ও অধ্যবসায়বর্জ্জিত, অতএব কোনমতে তাঁহার পার্ব্বতীয় সৈন্যের আক্রমণ নিবারণ করিতে পারিবেক না।

১০০১ খৃঃ অব্দে মামুদ দশ হাজার বাচা বাচা অশ্বসৈন্য লইয়া পেসোয়ারের সন্নিকটে পিতার শত্রু জয়পালকে পরাজয় করিলেন, এবং সিন্ধুর তীরবর্ত্তী ওয়েহিন্দ নামক কেল্লা ভূমিসাৎ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। জয়পাল যবনের হস্তে তিন তিন বার পরাজিত হইয়া নিতান্তনির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইলেন, এবং নিজপুত্র আনন্দপালকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া জ্বলন্তচিতায় জীবন বিসর্জ্জন করিলেন।

১০০৪ খৃঃ অব্দে গজনীপতি ভাতিয়ার অধিপতিকে শাসন করিবার নিমিত্ত অভিযান করেন। ভাতিয়ানগরী বিতস্তার পূর্ব্বপারে সন্নিবেশিত ও লাহোররাজ্যের অধীনস্থ ছিল।

পর বৎসর মামুদ মুলতানের সর্দ্দার আবুল ফাথলোদির প্রতিকূলে তৃতীয় বার যাত্রা করেন। আবুলফাথ সাবক্ত-গিনের নিকট অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু অধুনা আনন্দপালের উত্তেজনায় আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। গজনিপতি আনন্দপলাকে হটাইয়া দিয়া মুলতানের সর্দ্দারকে সর্ব্বতোভাবে পরাস্ত করিলেন। ইহার পর মামুদ তাতারদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু তিনবৎসরের মধ্যে তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিয়া পুনর্ব্বার ভারতবর্ষের বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন। গতবার আনন্দপাল যে তাঁহার প্রতিকূলে মূলতানের অধিপতিকে সাহায্য করিয়াছিলেন, সেইরাগে এবার বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া ১০০৮ অব্দের বসন্তকালে পঞ্জাবের দিগে ধাবমান হইলেন। আনন্দপাল এপর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি হিন্দুস্থানের ভিন্ন ভিন্ন রাজার নিকট দূত প্রেরণ পূর্ব্বক যাহাতে যবনের হস্ত হইতে হিন্দুজাতির ধর্ম্ম ও স্বাধীনতা রক্ষা পায়, তন্নিমিত্ত সকলকে আহ্বান করিতেছিলেন। তদনুসারে উজ্জয়িনী, গোয়ালিয়র, কালিঞ্জর, কান্যকুব্জ, দিল্লী ও আজমীরের ভূপতিগণ স্ব স্ব সৈন্যসামন্ত লইয়া পঞ্জাবে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিলেন। বোধ হয়, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর আর কখন তত সৈন্য রণক্ষেত্রে সমবেত হয় নাই। তৎকালে জ্ঞান হইতে লাগিল, যেন সমুদয় ভারতবর্ষ দুর্দ্দান্ত যবনের দমন করিবার জন্য একাগ্রমনে ব্যাপৃত হইয়াছে। অধিক কি হিন্দুমহিলাগণ দূর হইতে এই যুদ্ধের খরচ যোগাইবার জন্য নিজ নিজ

অলঙ্কার বিক্রয় পূর্ব্বক অর্থসংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে লাগি-লেন। সুনিপুণ মামুদ সম্মুখ সংগ্রামে অগ্রসর না হইয়া পেসোয়ারের নিকটে নিজ সৈনাগণ পরিখায় বেষ্টিত করিয়া শত্রুর প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। হিন্দুসেনা তাঁহার বারণ না মানিয়া প্রথম আক্রমণেই তাঁহার তিনচারি হাজার ফৌজকে রণশায়ী করিয়া ফেলিল। তখন আনন্দপাল এক অতিবৃহৎ মাতঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক শত্রু সৈন্য মর্দ্দন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার হস্তী শরাঘাতে ভীত হইয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। হিন্দু সৈনাগণ সেনাপতিকে দেখিতে না পাইয়া নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িল এবং যুদ্ধ হইতে ভঙ্গ দিবার উপক্রম করিল। মামুদ অবসর প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছিলেন। অধুনা ঘোর-তর বেগে শত্রুর উপর চড়াও হইলেন। প্রায় ২০ হাজার হিন্দু সৈন্য ভূতলশায়ী হইল। যবনেশ্বরের সম্পূর্ণ জয়লাভ হইল। অনন্তর তিনি নাগরকোটের সুপ্রসিদ্ধ মন্দির লুঠ করিয়া অসংখ্য অর্থসংগ্রহপূর্ব্বক গজনীতে প্রত্যাগমন করি লেন।

১০১০ খৃঃ অব্দে মামুদের পঞ্চমবারের অভিযান হয় তিনি এবার মুলতানের সর্দ্দারকে বন্দী করিয়া আনেন এবং আনন্দপালের সহিত সন্ধিস্থাপন করেন।

১০১৪ খৃঃ অব্দে মামুদ থানেশ্বরের প্রসিদ্ধ তীর্থ উৎসন্ন করিয়া যান। ইহার পরবৎসর কাশ্মীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করেন কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ভগ্নাশ হইয়া প্রত্যাগমন করেন।

১০১৮—১৯অব্দে মামুদের অষ্টমবারের অভিযান হয়। এইবার তিনি ১০,০০০ অশ্বসৈন্য ও ৩০,০০০ পদাতি সমভি-ব্যাহারে লইয়া হিমালয়ের ধারদিয়া গমন করত হঠাৎ কান্য-কুব্জ নগরে উপস্থিত হইলেন। রাজা তদ্দর্শনে ভীত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। মামুদ তাঁহাকে অভয়দান পূর্ব্বক মথুরার দিগে প্রস্থান করিলেন। কুড়িদিন পর্য্যন্ত এই প্রসিদ্ধ নগর যবনের নানাবিধ অত্যাচার সহ্যকরিয়া এক কালে উৎ-সন্ন হইয়া গেল। গজনীর অধীশ্বর মথুরার মনোহর প্রাসাদ সকল দেখিয়া এমনি প্রীত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন, যে স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিবার পর উহার অনুকরণে বহুসঙ্খ্যক অট্টালিকা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক নিজ রাজধানীকে সুশোভিত করি-তে প্রয়াস পাইলেন। তৎপ্রযুক্ত অল্পকালের মধ্যেই গজনী নগর যার পর নাই শোভাও সুসজ্জান্বিত হইয়া উঠিল।

কান্যকুব্জের রাজা যবনের শরণাগত হওয়াতে সকলের নিকট নিতান্ত ঘৃণাস্পদ হইলেন। কালিঞ্জরের অধীশ্বর তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত পঞ্জাবের রাজা দ্বিতীয় জয়-পালের সাহায্য পাইয়া তদ্বিপক্ষে রণসজ্জা করিতেলাগি-লেন। এই উপলক্ষে দুইপক্ষে যে সংগ্রাম হইল, তাহাতে কান্যকুব্জের ভূপতি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। মামুদ মিত্রের মৃত্যুসম্বাদ পাইয়া ক্রোধে অধীর হইলেন; এবং প্রভূত সৈন্য সমভিব্যাহারে পঞ্জাবে অবতরণ করিলেন [১০২২]। আনন্দ পালের পুত্র দ্বিতীয় জয়পাল সর্ব্বতোভাবে পরাজিত হইলেন। তখন মামুদ পঞ্জাব রাজ্য অধিকার করিয়া লইলেন, এবং উহার শাসনের জন্য একজন গবর্ণর নিযুক্ত

করিলেন। ইহাই ভারতবর্ষে যবনজাতির আধিপত্যের প্রথম সূত্রপাত।

১০২৩ অব্দে গজনীর অধীশ্বর কাশ্মীরদেশ জয় করিবার জন্য যাত্রা করেন; কিন্তু এবারও পূর্ব্বের ন্যায় ভগ্নাশ হইয়া আইসেন। পরবৎসর তিনি গোয়ালিয়র ও কালিঞ্জরের রাজাদিগকে পরাজয় করেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে ভূরি ভূরি স্বর্ণ, মণি মাণিক্য ও হস্তী প্রাপ্ত হন।

গজনীরাজ ১০২৬ অব্দে গুজরাটের অন্তঃপাতী সোমনাথ পত্তনের প্রতিকূলে যাত্রা করেন। ইহাই তাঁহার শেষ অভিযান ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। সোমনাথ তীর্থের অসংখ্য অর্থ আত্মসাৎ করিবার জন্য মামুদ এই সঙ্কটময় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। সিন্ধুদেশের অন্তঃপাতী যে মরুভূমি আছে, উহার মধ্য দিয়া গমন করিবার সময় তাঁহার সৈন্যগণ যেরূপ ভয়ানক ক্লেশপরম্পরা সহ্য করিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। যাহা হউক, অবশেষে মামুদ সোমনাথ পত্তনের বহির্ভাগে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যে রাজপুত রাজারা এই পবিত্র তীর্থের রক্ষার নিমিত্ত যুদ্ধার্থ সসজ্জ হইয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। এই উপলক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইল; অনেকক্ষণ জয় পরাজয় অনিশ্চিত রহিল। কিন্তু পরিশেষে হিন্দুরাজগণ রণ হইতে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন; মুসলমানদের সম্পূর্ণ জয় হইল। অনন্তর মামুদ নগর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সোমনাথ দেবের প্রতিমা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং উহার ভিতর হইতে পুরোহিতগণের চিরসঞ্চিত অপরিমিত মণিমাণিক্য প্রাপ্ত হইলেন।

গজনীপতি সোমনাথপত্তন হইতে ফিরিয়া আসিবার পর বড় অধিককাল জীবিত ছিলেন না। ১০৩০ অব্দে মানব-লীলা সম্বরণ করেন। তৎকালে আসিয়া খণ্ডে যত রাজা বিরাজমান ছিলেন, মামুদ সেই সকলের অগ্রগণ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেন। তিনি যেমন পরিণামদর্শী, তেমনি কার্য্য-তৎপর ছিলেন। তিনি সমরাঙ্গনে যেমন সাহস ও কৌশল দেখাইতেন, মন্ত্রভবনে ও তেমনি বিচক্ষণতা প্রকটন করিতেন। মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অবিচলিত নিষ্ঠা ছিল, তৎ-প্রযুক্ত তিনি হিন্দুদিগের প্রতি অনেক সময়ে ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছিলেন। মামুদ নিতান্ত ধনলোভী ছিলেন। কথিত আছে, ভারতবর্ষ নিষ্পেষণ পূর্ব্বক যে সমস্ত অর্থরাশি লুঠ করিয়া আনিয়াছিলেন, উহা মরণের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সম্মুখে সাজাইয়া রাখিতে আদেশ করেন। সাজান হইলে, কিছুকাল সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া রহিলেন, পরে অবিলম্বেই এই সমস্ত ফেলিয়া মহাযাত্রা করিতে হইবে ভাবিয়া অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তথাপি তিনি কৃপণ ছিলেন না। প্রত্যুত একজন প্রসিদ্ধ বিদ্যানুরাগী ও গুণগ্রাহী ভূপতি বলিয়া গণ্য হইতেন। তিনি একটি বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত করেন ও তৎকালের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের প্রতি বিলক্ষণ বদান্য ছিলেন। মামুদ রাজ-ধানীর শোভা সম্পাদন করিবার জন্য কদাপি ব্যয়সঙ্কোচ করেন নাই। তিনি যে একটি মসজিদ নির্ম্মাণ করেন, উহা এরূপ রমণীয় যে, "দিব্য সুন্দরী" নামে সমস্ত আসিয়া খণ্ডে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

মামুদের পরলোক হইলে, তাঁহার দুই যমজ পুত্র মহম্মদ ও মসায়ুদ রাজ্যের অধিকার লইয়া পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। মহম্মদ কেবল সাতমাস কাল রাজত্ব করিয়া পদ-চ্যুত হইলেন। মসায়ুদ ভ্রাতাকে অন্ধ করিয়া স্বয়ং সিংহা-সনে উঠিলেন। তিনি কয়েকবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন এবং হান্‌সি নামক কেল্লা অধিকার করিয়া লন। পঞ্জাবের গবর্ণর তাঁহার উৎসাহে কাশী পর্য্যন্ত অগ্রসর হন এবং উক্ত নগর প্রচণ্ড ভাবে বিলুণ্ঠন করিয়া যান।

১০৪০ অব্দে মসায়ুদ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার পর গজনীরাজ্যের ক্রমশঃ হ্রাস ও বিশৃঙ্খলতা ঘটিতে লাগিল। মসায়ুদের পর তাঁহার অন্ধ ভ্রাতা মহম্মদ পুনর্ব্বার কিছুকাল রাজত্ব করেন, তৎপরে মামুদ, তৎপরে আবদুল রসিদ, তৎপরে ইব্রাহিম, তৎপরে দ্বিতীয় মসায়ুদ, তৎপরে আরস-লান এবং পরিশেষে বেহরাম গজনী রাজ্য শাসন করেন। শেষোক্ত ভূপাল অনেক দিন মহাসমৃদ্ধি সহকারে রাজত্ব করিয়া শেষদশায় এক ঘোরতর দুর্ক্রিয়ার ফলে রাজ্যহারা হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

গজনী ও হিরাতের মধ্যবর্ত্তী যে পার্ব্বতীয় প্রদেশ আছে, উহার নাম ঘোর। ঘোরের সর্দ্দারেরা বরাবর বড়ই দুর্দ্দান্ত ছিলেন। মহারাজ মামুদ কষ্টেস্বষ্টে ঘোরজনপদের অধিপতি মহম্মদসুরীকে বশীভূত করেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর গজনী রাজ্যের যেমন অবনতি হইতে আরম্ভ হইল, ঘোরের সর্দ্দারেরা অমনি আপনাদের আধিপত্য বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। ঐবংশের একজন সর্দ্দার কুতুবুদ্দিন,

বেহরামের কন্যাকে বিবাহ করেন। কোন কারণে তাঁহাদের মধ্যে বিবাদ ঘটাতে বেহরাম ক্রোধে অন্ধ হইয়া জামাতার প্রাণনাশ করেন। কুতবের ভ্রাতা আলাউদ্দিন এই দারুণ দুষ্ক্রিয়ার প্রতিশোধ দিবার জন্য গজনীনগর আক্রমণ করিলেন এবং সাতদিন ক্রমাগত ভয়ঙ্কর ভাবে লুঠপাট করিতে লাগিলেন। বেহরাম শত্রুকে নিবারণ করিতে অক্ষম হইয়া লাহোরের অভিমুখে পলায়ন করিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে ভগ্নান্তঃকরণে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর তাঁহার পুত্র খসরু লাহোরে আশ্রয় লইলেন। অধুনা মামুদের সুবিস্তৃত রাজ্যের মধ্যে কেবল পঞ্জাব প্রদেশটি অবশিষ্ট রহিল।

১১৭৩ খৃঃ অব্দে আলা উদ্দিনের ভ্রাতুষ্পুত্র গয়াসুদ্দিন গজনী নগর রীতিমত অধিকার করিয়া লইলেন, এবং নিজ সহোদর সাবাবুদ্দিনকে সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া স্বয়ং ঘোররাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। সাবাবুদ্দিন ভারতবর্ষে মুসলমানজাতির আধিপত্যের সূত্রপাত করিয়া, পরে মহম্মদ ঘোরী নামে বিখ্যাত হন। এই উৎসাহশীল শাসনকর্ত্তা গজনীতে স্থাপিত হইবার দুই বৎসর পরে মুলতান নগর অধিকার করিয়া লন। কিন্তু পর বৎসর গুজরাটের রাজার নিকট পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসেন। তৎপরে ১১৮৪ অব্দে লাহোর নগরে খসরুর পুত্র খসরু মালিককে আক্রমণ করিলেন এবং ছলনাপূর্ব্বক তাঁহাকে বন্দী করিয়া পঞ্জাব রাজ্য স্ববংশে আনিলেন। এই সময় হইতেই মহারাজ মামুদের বংশ ইতিহাস হইতে তিরোহিত হইয়া গেল। ১১৯১ অব্দে মহম্মদ ঘোরী হিন্দুস্থানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার

নিমিত্ত প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু থানেশ্বরের সন্নিকটে পৃথ্বী রাজের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া নিতান্ত খিন্নমনে গজনীতে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং কিরূপে বৈরনির্য্যাতন দ্বারা সেই দারুণ পরাভবের পরিহার করিবেন, তজ্জন্য যত্নবান হইলেন। তৎকালে হিন্দুস্থানে চারিটি প্রধান হিন্দু-রাজ্য বিরাজমান ছিল। দিল্লী, কান্যকুব্জ, আজমীর ও গুজ-রাট যথাক্রমে তোমর, রাহতর, চৌহান, ও বঘিল্‌স * বংশের অধিকারভুক্ত ছিল। দিল্লীশ্বরের এক একটি কন্যাকে কান্যকুব্জ ও আজমীরের রাজারা বিবাহ করেন। তাঁহাদের গর্ব্ভে জয়চাঁদ ও পৃথ্বীরাজ নামে দুই পুত্র জন্মে। পৃথ্বীরাজ মাতামহ কর্ত্তৃক উত্তরাধিকারীরূপে পরিগৃহীত হইয়া দিল্লী ও গুজরাট উভয়রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হন। কিন্তু কান্য-কুব্জের অধীশ্বর জয়চাঁদ মাসতুতো ভ্রাতার এত অভ্যুদয় দেখিয়া ঈর্ষ্যাবশতঃ দিল্লীরাজ্যের অধিকার লইয়া তাঁহার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। এই ঘরাও ঝগড়াতে যবনে-শ্বরের দুরভিসন্ধি সফল হইবার বিলক্ষণ সুযোগ হইল; তথাপি পৃথ্বীরাজ নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি সমুদায় রাজ-পুত রাজাদিগকে নিজ পতাকার অনুবর্ত্তী করিয়া পুনর্ব্বার সেই থানেশ্বরের ময়দানে দুর্ব্বৃত্ত যবনের সহিত সাক্ষাৎ করি-লেন (১১৯৩)। দুইদলে ঘোরতর সংগ্রাম হইল। অবশেষে মহম্মদ ঘোরী জয়লাভ করিলেন, এবং পৃথ্বীরাজকে বন্দী স্বরূপ পাইয়া অকাতরে বধ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই

* বোধ হয়, এই বংশ চালুক্যবংশের পর গুজরাটের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

হিন্দুজাতির স্বাধীনতা ও বীরত্ব ভারতভূমি হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। অতঃপর মহম্মদ কুতুবুদ্দিনকে দিল্লীর গবর্ণর নিযুক্ত করিয়া গজনীতে প্রত্যাগমন করিলেন। খুতব আদৌ একজন ক্রীতদাস ছিলেন, পরে নিজ কার্য্যদক্ষতাগুণে ও প্রভুর অনুগ্রহে ক্রমশঃ উচ্চ উচ্চ পদে আরোহণ করেন। অধুনা তিনি প্রভুর অনুপস্থিতি কালে দিল্লীও মিরাট স্ববশে আনিলেন। পরবৎসর (১১৯৪) মহম্মদ ঘোরী কান্যকুব্জ পর্য্যন্ত অভিযান করিলেন এবং জয়চাঁদকে পরাজয় করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পর কুতবুদ্দিন সেনাপতি বক্তিয়ার খিলিজিকে প্রেরণ পূর্ব্বক বেহার ও বঙ্গদেশ জয় করিলেন (১২০৩) ও আপনার রাজ্য দৃঢ়ীভূত করিতে ব্যাপৃত হইলেন। এইরূপে ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে পর মহম্মদ ঘোরী পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে যাত্রা করিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে তাম্বুর ভিতর একদল গোক্ষুর জাতীয় সৈনিক কর্ত্তৃক হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া নিহত হইলেন। মহম্মদ ঘোরী স্বভাবতঃ সাহসী, নির্ভীক ও সমর পটু ছিলেন, কিন্তু বিজিত শত্রুর প্রতি অকারণ নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পাঠান বংশ। ১২০৬—১৫২৬।

মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পর, কুতবুদ্দিন অবাধে আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। তিনি স্বাধীন হইবার পর কোন বিশেষ কার্য্য করেন নাই, কেবল বর্ত্তমান রাজ্যভাগের দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ ব্যাপৃত হন। ১২১০ অব্দে তিনি পরলোকযাত্রা করিলে, তাঁহার পুত্র আরাম সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। কিন্তু একবৎসরকাল অতীত না হইতেই, কুতবের জামাতা আল্টমস তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়া স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইলেন। আল্টমস যদিও আদৌ একজন ক্রীতদাস, তথাপি অনেক রাজ-গুণে মণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে মোগলরাজ জঙ্গিশ খাঁ সমস্ত আসিয়া খণ্ডে দিগ্বিজয় করিয়া বেড়ান, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন নাই। তৎকালে খারিজম প্রদেশের ভূপতি, জঙ্গিষ খাঁ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া হিন্দুস্থানে আসিয়া আপনার আধিপত্য স্থাপন করিতে প্রয়াস পান, কিন্তু ভগ্নাশ হইয়া সিন্ধুরাজ কুবাচের নিকট আশ্রয় লইয়াছিলেন। আল্টমস অবিলম্বে সিন্ধুপতিকে পরাজয়পূর্ব্বক, তাঁহার সমুদায় রাজ্যপাট অধিকার করিলেন। বক্তিয়ার খিলিজির বংশীয় সর্দা-

রেরা বাঙ্গালা ও বিহারে একপ্রকার স্বাধীন হইয়াছিলেন। দিল্লীশ্বর তাঁহাদিগকে স্ববশে আনিলেন, এবং রন্তিমপুর, গোয়ালিয়ার, বিদিশা, উজ্জয়িনী প্রভৃতি রাজ্য সকল জয় করিয়া প্রায় সমুদয় হিন্দুস্থানে নিজের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

এই সময়ে বোগদাদের খলিফা তাঁহাকে ভারতবর্ষের অধীশ্বর বলিয়া অভিনন্দন করিয়া পাঠাইলেন। তৎপ্রযুক্ত তাঁহার গৌরবের পরিসীমা রহিল না। ১২৩৫ অব্দে মহারাজ আল্টমস মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তখন তাঁহার পুত্র রুকুনুদ্দিন ফিরোজ রাজতক্তে বসিলেন; কিন্তু ছয় মাস কাল অতীত না হইতেই তাঁহার ভগিনী রেজিয়া তাঁহাকে অপসারিত করিয়া স্বয়ং রাজদণ্ড গ্রহণ করিলেন। আল্টমস মরণ সময়ে পুত্রগণকে উপেক্ষা করিয়া রেজিয়াকে যে রাজত্বে বরণ করিয়া যান, তাহা যুক্তিসঙ্গত। কারণ এই রাজকন্যা পুরুষের ন্যায় অধ্যবসায়, কৌশল ও প্রভাবসম্পন্না ছিলেন। অধুনা সবিশেষ দক্ষতাসহকারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। যে সকল ওমরারা তাঁহার অভ্যুদয়ে আপত্তি করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার পৌরুষ দর্শন করিয়া মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। কিন্তু স্ত্রীজাতিসুলভ চপলতায় তাঁহার সমুদয় গুণ নিষ্প্রভ হইয়া গেল। তিনি একজন আবিসীনিয়া দেশীয় ক্রীতদাসের প্রতি সাতিশয় পক্ষপাত প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তৎপ্রযুক্ত রাজধানীর সম্ভ্রান্ত-লোকেরা যৎপরোনাস্তি কুপিত হইলেন। এই সুযোগে সরহিন্দ বিভাগের গবর্ণর আল্টনিয় বিদ্রোহ উত্থাপন

করিলেন, এবং রণক্ষেত্রে অবতরণ পূর্ব্বক ঐ আবিসীনিয় দাসকে সংহার করিয়া রাজ্ঞীকে নিকা করিয়া ফেলিলেন। আল্টুনিয় এখন নিঃশঙ্কমনে দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তদ্দর্শনে রাজ্যের ওমরাগণ সমবেত হইয়া রেজিয়ার সহিত তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করিলেন [১২৩৯]।

অনন্তর রেজিয়ার আর এক ভ্রাতা বেহরাম সাহ ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দিন মসায়ুদ ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করিলেন। তৎপরে ১২৪৬ অব্দে আল্টমসের পৌত্র নসিরুদ্দিন মহম্মদ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। তিনি নিতান্ত ধার্ম্মিক ও শান্তস্বভাব ছিলেন, সর্ব্বদা কোরাণের নকল করিয়া কাল কাটাইতেন, রাজকার্য্যে তাদৃশ মনোযোগ দিতেন না। তাঁহার উজির গিয়াসুদ্দিন বুলবন তাঁহার নামে সমুদয় বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব চালাইতেন। মহারাজ আল্টমসের চল্লিশ জন তুরস্ক জাতীয় ক্রীতদাস ছিল। তাহারা সকলে রাজ্যের মহৎ মহৎ পদে আরোহণ করে এবং পরস্পরের সাহায্যার্থ এক পরামর্শী হয়। বুলবন এই দলের কর্ত্তা। তিনি আল্টমসের একটি কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া পূর্ব্বাবধি রাজসংসারে অনেক আধিপত্য চালাইয়া আসিতেছিলেন, অধুনা নসিরুদ্দিনের রাজত্ব সময়ে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। ১২৬৫ খৃঃ অব্দে প্রভুর পরলোক হইলে, বুলবন অবাধে সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রথম নিজ দলভুক্ত সেই তুরস্কজাতীয় ক্রীতদাসগণের প্রাণনাশার্থ হুকুম দিলেন। তাহাদিগের মধ্যে অনেকের সঙ্গে যে তাঁহার একান্ত ঘনিষ্টতা ছিল, উহা তাঁহার মনে একবারও উদিত হইল না। অনন্তর

তিনি সমুদায় চক্রান্তের উচ্ছেদ করিবার জন্য এক দল গুপ্ত-চর নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন। সৈন্যের উন্নতি সাধন করিবার নিমিত্ত তৎপর হইলেন এবং সুকঠিন নিয়ম সকল স্থাপন পূর্ব্বক রাজ্যমধ্যে কোন উপদ্রব না ঘটে, তদ্বিষয়ে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। এই সকল উপায় বলে তাঁহার সুদীর্ঘ রাজত্ব সময়ে কোথায়ও কোন উৎপাত উপস্থিত হয় নাই; কেবল বাঙ্গালা বিভাগের শাসনকর্ত্তা টোগরাল আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়া দেন। বুলবন তাঁহার শাসনার্থ ক্রমে দুই দল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু তদ্দ্বারা কোন ফলোদয় হইতেছে না দেখিয়া স্বয়ং সসৈন্যে যাত্রা করিলেন; এবং টোগরালকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া আপনার মধ্যম পুত্র বগরা খাঁকে বাঙ্গালা প্রদেশের সুবেদারীপদে অভি-ষিক্ত করিয়া আসিলেন।

এদিকে মোগলেরা পঞ্জাব রাজ্য আক্রমণ করিল। সম্রা-টের জ্যেষ্ঠপুত্র গুণশালী মহম্মদ তাহাদিগকে বারম্বার পরাজয় করিলেন, কিন্তু অবশেষে শত্রুর অনুসরণকালে একদল সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া প্রাণ হারাইলেন। যুব-রাজ মহম্মদ মহৎ মহৎ গুণের আধার ছিলেন, তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সকলে নিতান্ত শোকাকুল হইল; অধিক কি, বুলবনেরও কঠিন অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হইল। অবিলম্বেই সম্রাট আপনার চরম কাল উপস্থিত জানিয়া, দ্বিতীয় পুত্র বগরা খাঁকে আহ্বান করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে বঙ্গরাজ্যের প্রতি অৎপরোনাস্তি আসক্ত দেখিয়া, নিতান্ত বিরক্ত হই-লেন এবং মহম্মদের পুত্র কৈ-খসরুকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী

করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। অনন্তর রাজ্যের ওমরারা, এরূপ হইলে পাছে গৃহবিচ্ছেদ ঘটে, এই ভাবিয়া কৈ—খসরুকে পঞ্জাবের গবর্ণরীপদে বরণ করিয়া, বগরা খাঁর পুত্র কৈকোবাদকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন।

কৈকোবাদ নিতান্ত সৌখীন ও বিলাসপ্রিয় ছিলেন। তিনি নিজ উজির নাজিমুদ্দিনের হস্তে রাজ্যের সমুদায় ভার অর্পণ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় সেবায় নিমগ্ন হইলেন। নাজিমুদ্দিন যেমন ক্রুর, তেমনি দুরাকাজ্ক্ষ ছিলেন। তিনি লাহোরের গবর্ণর কৈ-খসরুর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরে তাঁহাকে নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধির পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বী জানিয়া গোপনে সংহার করিলেন। অনন্তর সম্রাট ও বগরা খাঁর মধ্যে বিরোধ বাঁধাইবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। দুর্বুদ্ধি কৈকোবাদ মন্ত্রীর কুমন্ত্রণায় পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বগরা খাঁ ও সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। কিন্তু যুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। কৈকোবাদ সিংহাসনের উপর হইতে দেখিতে পাইলেন, পিতা অতিদীনবেশে পদে পদে কুর্ণিস করিতে করিতে আসিতেছেন। তখন তাঁহার পাষাণহৃদয় দ্রবীভূত হইয়া গেল। তিনি আর থাকিতে না পারিয়া, সিংহাসন হইতে পিতার চরণতলে পতিত হইলেন এবং তাঁহার কণ্ঠ ধারণ পূর্ব্বক অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন সুধীর বগরাখাঁ পুত্রকে সান্ত্বনা করিয়া, ন্যায় অনুসারে রাজ্যশাসন করিবার নিমিত্ত বারম্বার উপদেশদিয়া নিজ অধিকারে প্রস্থান করিলেন। কৈকোবাদ ও রাজধানীতে ফিরিয়া

আসিলেন, কিন্তু পিতার হিত উপদেশ বিস্মৃত হইয়া পূর্ব্বের মত বদকেয়ালীতে মাতিলেন। অবিলম্বে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী নাজিম বিষপান দ্বারা নিহত হইলে পর, জেলালদ্দিন খিলিজি তৎপদে নিযুক্ত হইলেন। নূতন উজির অল্প কালের মধ্যেই নিজ আধিপত্য সর্ব্বতোভাবে স্থাপিত করিয়া প্রভুর প্রাণনাশপূর্ব্বক স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইয়া বসিলেন (১২৯০)। এই রূপে দাসবংশ কুতবুদ্দিন হইতে কৈকোবাদ পর্য্যন্ত দশপুরুষ স্থায়ী হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। অতঃপর রাজলক্ষ্মী খিলিজিবংশকে অনুগৃহীত করিলেন।

জেলালদ্দিন রাজ্যপদ হস্তগত না করিতেই, তুরষ্কজাতীয় ওমরাগণ কৈকোবাদের পুত্রকে সিংহাসনে উত্থাপিত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। নূতন সম্রাট চক্রান্তকারীদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া, রাজপুত্রকে সংহার করিলেন। কিন্তু বিজিত বিদ্রোহিগণের প্রতি কোনরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলেন না। যদিও তিনি রাজ্যপদ হস্তগত করিবার জন্য ঘোরতর প্রত্যবায়গ্রস্ত হইয়াছিলেন, তথাপি তৎপরে নিয়তই সকলের প্রতি শান্ত ও সদয় ব্যবহার করিতেন। অধিক কি, দস্যুগণ সম্রাটের ভালমানুষীতে উৎসাহিত হইয়া, অত্যাচার করিতে লাগিল। সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দিন অযোধ্যার গবর্ণর ছিলেন। তিনি কাহাকে কিছু না বলিয়া সসৈন্যে মহারাষ্ট্রের রাজধানী দেবগিরি নগরের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং রাজা রামদেবকে পরাজয়পূর্ব্বক কর দিতে সম্মত করাইলেন। জেলালদ্দিন ভ্রাতুষ্পুত্রের অনধিকার চর্চ্চায় কিঞ্চিন্মাত্রও

রোষ প্রকাশ না করিয়া, বরং তাঁহার জয়লাভে হর্ষ করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার স্তোভবাক্যে ভুলিয়া কয়েক জন মাত্র অনুচর সমভিব্যাহারে লইয়া তাঁহাকে প্রত্যুদ্গমন করিতে চলিলেন। দিল্লীর অদূরেই উভয়ে সাক্ষাৎ হইল। তখন বৃদ্ধ জেলালদ্দিন যেমন স্নেহভরে ভ্রাতুষ্পুত্রকে আলিঙ্গন করিবেন, অমনি সেই পামর তাঁহার প্রাণনাশ করিয়া ফেলিল। (১২৯৫)

এই সম্বাদ দিল্লীতে পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই, মৃত সম্রাটের কনিষ্ঠপুত্র ইব্রাহিমকে সিংহাসনে স্থাপিত করা হইল। কিন্তু আলাউদ্দিন রাজধানীর দিকে আসিতেছেন শুনিয়া, তিনি, মুলতানের গবর্ণর তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর অর্কালি খাঁর নিকট পলায়ন করিলেন। কিছুকালের মধ্যেই দুরাত্মা আলা কৌশলক্রমে পিতৃব্যপত্নী ও তাঁহার উক্ত দুই পুত্রকে হাতে পাইয়া অকাতরে সংহার করিল। আলাউদ্দিন এইরূপে নিষ্কণ্টক হইয়া দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। তিনি যেমন কার্য্যতৎপর ও সাহসী, যেমনি নৃশংস ও দুরাকাঙ্ক্ষ। ১২৯৭ অব্দে নূতন সম্রাট গুজরাট-রাজ্য সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া লইলেন। এই উপলক্ষে তাঁহার একদল সৈন্য মিয়ুটিনি উত্থাপন করিল। তিনি তদ্দর্শনে কোপে অধীর হইয়া, প্রথমতঃ বিদ্রোহীদের স্ত্রীপুত্র-দিগকে অকাতরে হত্যা করিলেন, অবশেষে তাহাদিগকে গ্রেপ্তারপূর্ব্বক যমালয়ে প্রেরণ করিলেন।

১২৯৮ অব্দে মোগলেরা আসিয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিল। তাঁহার সেনাপতি জাফর খাঁ তাহাদিগকে পরা-

জয় করিয়া তাহাদের অনুসরণ করিলেন। কিন্তু তাহারা প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিল। সেনাপতি কিয়ৎক্ষণ আত্মরক্ষণ করিয়া শত্রুর আঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন। আলাউদ্দিন মনে করিলে, তাঁহার সাহায্যার্থ একদল ফৌজ পাঠাইয়া দিয়া, তাঁহার প্রাণরক্ষা করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি জাফার খাঁর রণকৌশল দেখিয়া ঈর্ষ্যাযুক্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং এই সুযোগে পরে পরে শত্রুক্ষয় হইল দেখিয়া বরং তাহার মনে স্বস্তি হইল। যাহা হউক শীঘ্রই বোধ হইল, তিনি এই সকল দুষ্কর্ম্মের ফল হাতে হাতেই পাইবেন। ১২৯৯ অব্দে একদা আলাউদ্দিন মৃগয়ার্থ বহির্গত হইলে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সলিমান একদল লোক সঙ্গে লইয়া তাঁহাকে আক্রমণপূর্ব্বক ক্ষতবিক্ষত করিল এবং মৃতবোধে পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনাকে দিল্লীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিল। কিন্তু বস্তুতঃ আলাউদ্দিন মরেন নাই। তিনি সত্বর যোধগণের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহারা প্রভুকে জীবিত দেখিয়া হর্ষপ্রকাশ করিতে লাগিল। তিনি সহজে নিজ আধিপত্য পুনঃস্থাপিত করিয়া, সলিমানের প্রাণদণ্ড করিলেন। এই প্রকার আর তিনবার তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার চেষ্টা হয়; কিন্তু তিনি প্রতিবারই উহার প্রতিবিধান করিয়া বিদ্রোহীদিগের প্রতি দারুণ দণ্ডবিধান করেন।

১৩০০ খৃঃ অব্দে সম্রাট রন্তিম্ভপুরের কেল্লা অধিকার করিলেন; এবং উহার তিন বৎসর পরে চিতোরের দুর্ভেদ্য দুর্গে জয়পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া দিলেন। দেবগিরির রাজা

পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কর বন্ধ করাতে, আলাউদ্দিন ১৩০৬ অব্দে নিজের প্রিয় সেনাপতি মল্লিক কাফুরকে তৎপ্রতিকূলে প্রেরণ করিলেন। কাফুর আদৌ কাম্বেবাসী একজন সওদাগরের ক্রীতদাস ছিলেন। আলাউদ্দিন গুজরাট জয় করিবার সময় তাঁহাকে ডাকিয়া আনেন। তিনি অবিলম্বেই প্রভুর একান্ত অনুগ্রহের পাত্র হইলেন, এবং ক্রমে রাজ্যের উচ্চ উচ্চ পদে অধিরোহণ করিতে লাগিলেন। অধুনা কাফুর প্রভুর আদেশ পাইয়া দেবগিরির দিকে অভিযানপূর্ব্বক রামদেবকে সহজে পরাজিত করিলেন। তিনিও পূর্ব্বের ন্যায় কর দিতে সম্মত হইলেন। ১৩০৯ অব্দে মল্লিক কাফুর প্রভুর আদেশ ক্রমে তৈলঙ্গ রাজ্যের রাজাকে পরাজয় পূর্ব্বক তাঁহার রাজধানী বরঙ্গল নগর গ্রহণ করিলেন। রাজা গত্যন্তর না দেখিয়া কর দিতে স্বীকৃত হইলেন। ইহার পরবৎসর সেনাপতি বল্লালবংশ ধ্বংস করিয়া কর্ণাট রাজ্যের পূর্ব্বভাগ স্ববশে আনিলেন এবং প্রভুর কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ এক বৃহৎ মসজিদ রামেশ্বর তীর্থের সন্নিকটে নির্ম্মাণ করিলেন। এই সময়ে রামদেবের মৃত্যু হইল। তাঁহার পুত্র দেবগিরির সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন; এবং মুসলমানদের অধীনতা হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। অতএব কাফুর ১৩১২ অব্দে আবার যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। দেবগিরির রাজা সহজে পরাজিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর মুসলমান সেনাপতি মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটের অন্তর্গত অন্যান্য রাজাদিগকে বশীভূত করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাগত হইলেন। অধুনা রাজ্যমধ্যে মল্লিক কাফুরের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত

হইল। তিনিও আপনার পথ নিষ্কণ্টক করিবার নিমিত্ত নানা চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। আলাউদ্দিন নিরন্তর মাদকদ্রব্য সেবন করিয়া নিতান্ত কগ্ন ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এখন নিতান্ত খিটখিটে ও সন্দেহশীল হইয়া উঠিলেন, কিন্তু কাফুরের কথায় মরেন ও বাঁচেন। কাফুর যাহা বলিবে, অবিচারিতচিত্তে করিবেন। কাফুরের কুমন্ত্রণায় প্রধানা মহিষী, জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম রাজকুমারকে কারারুদ্ধ করিলেন; নিজ সহোদর আলফ খাঁ ও প্রধান সেনাপতি আলপখাঁকে নিধন করিলেন। এদিকে তাঁহার রাজ্যের দক্ষিণ বিভাগে স্থানে স্থানে বিদ্রোহ উত্থাপিত হইতে লাগিল। এই সকল গোলযোগের মধ্যে সম্রাট প্রাণত্যাগ করিলেন (১৩১৬)।

আলাউদ্দিন একজন সাহসসম্পন্ন ও কার্য্যতৎপর লোক ছিলেন। যুদ্ধবিদ্যায় তাঁহার অসামান্য নৈপুণ্য ছিল, কিন্তু তিনি নিতান্ত নৃশংস, দর্পিত ও অব্যবস্থিতচিত্ত। যদিও রাজসিংহাসনে বসিবার পর লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করেন তথাপি সুপণ্ডিত সভাসদগণ কখন ও তাঁহার মতের বিপরীত কথা বলিতে পারিতেন না। সময়ে সময়ে তাঁহার মনে নানা খেলের উদয় হইত। তিনি একদা স্থির করিলেন যে, আমি আপনাকে মহম্মদ বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিব এবং একটী নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিব। আর এক সময়ে পৃথিবী জয় করিবার জন্য মতলব আটিতে লাগিলেন এবং প্রকাশ্যরূপে "দ্বিতীয় আলেক্জাণ্ডার" এই উপাধি ধারণ করিলেন।

আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর মলিক কাফুর তাঁহার সর্ব্ব-

কনিষ্ঠপুত্র একটী বালককে সিংহাসনে বসাইলেন। তৎপরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্রের চক্ষু উৎপাটনপূর্ব্বক, তৃতীয় পুত্র মবারিকের নিধনের জন্য কয়েক জন বদমায়সকে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু তাহারা রাজকুমারের পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক কাফুরকেই সংহার করিল। অনন্তর মবারিক নিষ্কণ্টকে রাজপদে আরূঢ় হইলেন। কিন্তু রাজ্যের সমুদায় ভার পরম প্রিয়পাত্র খসরুখাঁর হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক ইন্দ্রিয় সেবায় নিমগ্ন হইলেন। খসরু আদৌ অতি নীচ জাতীয় একজন ক্রীতদাস ছিলেন, পরে মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া দিল্লীর রাজ-সংসারে প্রবেশ করেন, এবং মবারিকের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। খসরু ১৩১৯ অব্দে মলবারদেশ জয় করিলেন এবং তথা হইতে বহু অর্থ লুট করিয়া দিল্লীতে আনিলেন। ইহার পরবৎসর খসরু খাঁ প্রভুকে সংহারপূর্ব্বক স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইলেন। এই সম্বাদ পাইয়া পঞ্জাবের গবর্ণর গাজি খাঁ বিদ্রোহ উত্থাপনপূর্ব্বক সসৈন্যে দিল্লীর অভিমুখে অভিযান করিলেন। দুই দলে ঘোরতর সংগ্রাম হইল। সেই সংগ্রামে খসরু নিহত হইলেন। অনন্তর গাজি খাঁ "গিয়াসুদ্দিন তোগলক" এই উপাধি ধারণপূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন (১৩২০)। এইরূপে খিলজিবংশ নির্ম্মূল হইলে পর, তোগলকবংশ দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইল।

তজ্জন্য ব্যাপৃত হইলেন। ১৩২৫ অব্দে তিনি বঙ্গদেশে অভিযান করিলেন। বর্ষীয়ান বগরা খাঁ তখনও বঙ্গদেশ শাসন করিতেছিলেন। নূতন সম্রাট তাঁহাকে স্বপদে বজায় রাখিয়া, সোনারগাঁ ও ত্রিহুত এই দুইটী জনপদ স্ববশে আনয়ন পূর্ব্বক দিল্লীর অভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন। যুবরাজ জুনা খাঁ পিতার সম্বর্দ্ধনার নিমিত্ত একটী দারুময় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্রাট সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক আমোদ প্রমোদ করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা গৃহ ভূমিসাৎ হইয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করিল। সৌভাগ্যক্রমে তৎকালে জুনা খাঁ তথায় অনুপস্থিত ছিলেন। এই শোচনীয় ব্যাপারের পূর্ব্বাপর ঘটনা ও যুবরাজের চরিত্র বিষয়ে অনুধাবন করিয়া দেখিলে তাঁহার উপর দারুণ সন্দেহ জন্মে।

১৩২৫ খৃঃ অব্দে জুনা খাঁ "মহম্মদ তোগলক" উপাধিধারণ পূর্ব্বক সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন। ইহা সকলেই স্বীকার করেন, যে তিনি তৎকালের সমুদয় নরপতি অপেক্ষা বাগ্মী, সুপণ্ডিত ও বীর্য্যবান ছিলেন। তিনি যেমন কার্য্যদক্ষ,বদান্য ও মিতাহারী তেমনি স্বধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। কিন্তু এই সকল দুর্ল্লভ গুণ, তাঁহার স্বভাবদোষে নিষ্ফল হইয়া যায়। তিনি নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল, নৃশংস, একগুঁয়ে ও বদরাগী ছিলেন। ন্যায়ান্যায় ও হিতাহিত বিচার না করিয়াই সহসা কোন দুর্ঘট মতলব আঁটিতেন এবং উহা হাসিল করিবার নিমিত্ত যত কেন অর্থ ব্যয় হউক না,যতকেন ক্লেশভোগ ও প্রাণহানি হউক না, কিছুতেই পরাঙ্মুখ হইতেন না।

তিনি সর্ব্বাগ্রে দাক্ষিণাত্যের সমুদয় গোলযোগ নিবারণ পূর্ব্বক পারস্যদেশ জয় করিবার জন্য বহুলসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। কিন্তু যোদ্ধগণ কিছুদিনের মধ্যে তাঁহার কোষ নিঃশেষ করিয়া ফেলিল, এবং অবশেষে চতুর্দ্দিকে ছড়িয়া পড়িয়া লুটপাট আরম্ভ করিল। অনন্তর মহম্মদ চিনরাজ্য জয় করিবার জন্য একদল ফৌজ প্রেরণ করিলেন। তাহারা বহুকষ্টে হিমালয় পার হইয়া দেখিতে পাইল যে চিনের অধিপতি তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত বহুসংখ্যক সৈন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। দিল্লীশ্বরের সৈন্য তৎকালে এরূপ ক্লান্ত ও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল, যে বিপক্ষের সহিত সংগ্রামে সাহস করিতে পারিল না। এদিকে তাহাদের রসদ নিঃশেষ হইয়াগিয়াছিল এবং বর্ষা ও উপস্থিত। সুতরাং শত্রুর দিগে পৃষ্ঠ করাই উচিত। এই ভাবিয়া তাহারা যেমন পাছু হটিবে, অমনি দুর্দান্ত চিন সৈন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। শত্রুর আক্রমণে, পার্ব্বতীয় অসভ্য জাতির উৎপাতে, বর্ষার জলপ্লাবনে, ও দুর্ভিক্ষের অনুগ্রহে সেই বিশাল সৈন্য পালে পালে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। অবশেষে ভগ্নদূতের কার্য্য করে, এমন একটী প্রাণীও তাহাদের মধ্য হইতে ফিরিয়া আসিল না।

মহম্মদ দেবগিরি নগর দর্শন করিয়া এমনি প্রীত হইয়াছিলেন যে, উহাকে "দৌলতাবাদ" এই নাম দিলেন এবং নিজ রাজধানী, দিল্লী হইতে তথায় অপসারিত করিবার জন্য উৎসুক হইলেন। মনে এই খেলের উদয় হইতে না হইতেই, তিনি দিল্লীর অধিবাসীদিগকে দলে দলে দৌলতাবাদে

উঠিয়া যাইতে হুকুম করিলেন। পরে দুই দুইবার তথা হইতে দিল্লীতে ফিরিয়া আসিতে অনুমতি করিলেন, আবার দৌল-তাবাদে প্রস্থান করিতে আদেশ দিলেন। যে ব্যক্তি এই আজ্ঞা পালন না করিবে সে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইবেক। সুতরাং কাহারও নিস্তার ছিল না। মহম্মদের "দৌলতাবা-দের খেলেতে" যে কত সহস্র লোকের প্রাণনাশ ও সর্ব্ব-নাশ হয়, তাহা বলা দুঃসাধ্য। কিন্তু পরিশেষে তাঁহার এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ ও হয় নাই। এই সকল নিষ্ফল খরচে তাঁহার ধনাগার শূন্য হইয়া পড়িল। তিনি সেই অভাব পরিহার করিবার নিমিত্ত চিনদিগের দৃষ্টান্ত অনুসারে নোট প্রচলিত করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু লোকের কাছে গবর্ণমেণ্টের বাজারসম্ভ্রম বড় ভাল ছিল না। ভাঙ্গাইবার জন্য শীয় বণিকেরা তাঁহার নোট লইতে অস্বীকার করান হয়, শেষে মহম্মদ বহু পীড়াপীড়ির পর বুঝিয়া হইতে প্রবা-নোট চালান আপাততঃ অসম্ভব।

সম্রাটের উৎপীড়নে কি প্রজালোক, কি প্রচারিত সকলেই যৎপরোনাস্তি অপরক্ত হইয়াছিল। মালয়া দেন, করমণ্ডল, ও পঞ্জাব প্রভৃতি বিভাগে বিদ্রোহ উপস্থিত হই-লাগিল। কিন্তু মহম্মদ অসাধারণ শৌর্য্য ও কৌশল প্রকা-পূর্ব্বক একে একে তৎসমুদয় নিবারণ করিলেন।

১৩৪৪ অব্দে কর্ণাটের রাজা বুকরায় বিজয় নগরে এক-নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ মাধ-বাচার্য্য তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। মাধবাচার্য্যের উৎসাহে ও যত্নে সংস্কৃতবিদ্যা পুনর্ব্বার উজ্জীবিত হইয়াছিল। এই

বংশের রাজাবলী ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত দুর্ব্বল বংশের সঙ্গে সমভাবে যুঝিয়া, অবশেষে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। যে অব্দে কর্ণাটদেশ স্বাধীন হইয়াছিল, সেই বৎসর তৈলঙ্গের রাজা নিজ রাজধানী বরঙ্গুল নগরের পুনরধিকার প্রাপ্ত হন, এবং স্বরাজ্য হইতে সম্রাটের রক্ষিসৈন্য সকল তাড়াইয়া দিয়া আপনার প্রভুত্ব পুনর্ব্বার স্থাপিত করেন। ইহার তিন বৎসরের পর, ১৩৪৭ অব্দে যৎকালে মহম্মদ গুজরাটের বিদ্রোহ নিবারণ করিতে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন শুনিতে পাইলেন, যে জাফর খাঁ * দাক্ষিণাত্যের ওমরাগণের সাহায্যে তাঁহার প্রতিনিধিকে নিধন পূর্ব্বক নর্ম্মদার দক্ষিণ অংশে আপনার আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন, এবং গোলকন্দার পশ্চিমে কলবর্গা নগরীতে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাই সুবিখ্যাত বামনি রাজ্যের প্রথম পত্তন। যাহা হউক, সম্রাট প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে গুজরাট সম্পূর্ণরূপে বশীভূত না করিয়া, দাক্ষিণাত্যের বিষয়ে মনোনিবেশ করিবেন না। অতএব বিদ্রোহীদের অনুসরণ করত তাতা পর্য্যন্ত পৌঁছিলেন। তাঁহার শরীর ইতি পূর্ব্বেই রুগ্ন হইয়াছিল। এখন তিনি হঠাৎ পীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। [১৩৫১]

* জাফর আদৌ গঙ্গা নামক একজন ব্রাহ্মণের ক্রীতদাস ছিলেন। কথিত আছে, তাঁহার প্রভু তাঁহার ভাবী অভ্যুদয়ের বিষয় জানিতে পারিয়া, তাঁহার প্রতি অসাধারণ অনুকম্পা প্রকাশ করিতেন। জাফর খাঁ রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া, উক্ত ব্রাহ্মণের প্রতি তাঁহার যে ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল, উহার স্মরণার্থ "সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন গাঙ্গবামনি" এই উপাধি ধারণ করেন।

মহম্মদ তোগলকের পরলোক হইলে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ফিরোজসাহ রাজপদে অধিষ্ঠান করিলেন। ফিরোজ যেমন দুর্ব্বলচিত্ত, মদ্যাসক্ত ও মৃগয়ানুরক্ত, তেমনি অমায়িক ও ক্ষমাশীল ছিলেন। তিনি বাঙ্গালা দেশ স্ববশে আনিবার জন্য দুই দুইবার রণসজ্জা করেন। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া প্রথমে বঙ্গরাজ্যের ও তৎপরে দাক্ষিণাত্যের স্বাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। অনন্তর সম্রাট মন্ত্রিবর খানজিহানের হস্তে সমুদায় রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক সাধারণের উপকারার্থ পূর্ত্তকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। স্থানে স্থানে জলাশয়, সরাই, হাঁসপাতাল, পুল, বাঁধ, মসিদ এবং অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার স্থাপিত হিসারফিরোজ নগরে নির্ম্মল জল যোগাইবার জন্য যমুনা ও শতদ্রুর মধ্যে যে একটি কুল্যা খনন করান হয়, উহাই সর্ব্বপ্রধান। উহার যে শাখাটি যমুনা হইতে প্রবাহিত হয়, তাহা অদ্যাপি ব্যবহার্য্য রহিয়াছে।

ফিরোজসাহ অনেকগুলি উৎকৃষ্ট আইন প্রচারিত করেন। তিনি কয়েক স্থলে প্রাণদণ্ডের বিধি উঠাইয়া দেন, এবং অঙ্গবৈকল্যদ্বারা দণ্ডবিধান ও দোষ স্বীকারার্থ শারীরিক যন্ত্রণাদান একবারে রহিত করেন। ইহা তাঁহার পক্ষে সামান্য শ্লাঘার বিষয় নহে যে, তিনি প্রজাদের স্কন্ধ হইতে অনেক ক্লেশকর টেক্স উঠাইয়া দিয়াও রাজ্যের রাজস্ববিষয়ে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। ১৩৮৮ অব্দে ফিরোজসাহ নব্বই বৎসর বয়সে সংসারযাত্রা সম্বরণ করিলেন। এই ঘটনা হইতে মামুদ সাহের অভিষেক পর্য্যন্ত

যে চৌদ্দবৎসরকাল অতীত হয়, তন্মধ্যে প্রথমতঃ সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্রের পুত্র গিয়াসুদ্দিন সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তৎপরে তাঁহার মধ্যমপুত্রের পুত্র আবুবেকর, তৎপরে তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র নসিরদ্দি, অবশেষে নসিরদ্দির জ্যেষ্ঠপুত্র হোমায়ুন রাজাসনে অধিষ্ঠিত হন। হোমায়ুন পঁয়তাল্লিশ দিনমাত্র রাজত্ব করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে পর, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মামুদ ১৩৯২ খ্রঃ অব্দে তৎপদে অভিষিক্ত হইলেন। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যাবিধুর, তাঁহার রাজত্বকালে দিল্লীর সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। তাঁহার প্রধান প্রধান অমাত্যগণ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে স্ব স্ব আধিপত্য স্থাপন পূর্ব্বক স্বাধীন হইতে লাগিলেন। তাঁহার উজির খোজাজিহান জোয়ানপুর রাজ্য স্থাপিত করিলেন; জাফর খাঁ "মজাফরসাহ" উপাধি ধারণ পূর্ব্বক গুজরাটে গিয়া প্রভুত্ব করিতে লাগিলেন; এবং দেলোয়ার খাঁ মালবদেশ অধিকার করিয়া লইলেন।

এই সময়ে ১৩৯৮ অব্দে সুপ্রসিদ্ধ তৈমুর খাঁ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তিনি তুরস্ক ও মোগল সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া, ইতিপূর্ব্বেই আসিয়ার সমস্ত পশ্চিম ও মধ্যবিভাগ জয় করিয়াছিলেন। সমরকন্দে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত ছিল। বুখারা তাঁহার আর একটী প্রধান নগর। তিনি দিল্লী নগরীতে প্রবেশ পূর্ব্বক এককালে সমুদয় উৎসন্ন করিয়া ফেলিলেন। পাঁচ দিন কাল ক্রমাগত তাঁহার মহৎ উৎসব চলিল; এদিকে তাঁহার সৈনিকগণ ভয়ঙ্করভাবে পৌরজনের সম্পত্তি বিলুণ্ঠন পূর্ব্বক তাহাদিগকে হত্যা করিতে লাগিল

শোণিতের স্রোত গেট সকল প্লাবিত করিয়া বহিতে লাগিল এবং চতুর্দ্দিগ শবে স্তূপাকার হইল। এত কষ্টের পর তৈমুরের উৎসব শেষ হইল! তখন তিনি ভক্তি পূর্ব্বক পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়া স্বদেশের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার পথের দুধার কেবল লুটপাট, নর-হত্যা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর দাপটে ও হতাশে সতত কোলাহলময় হইতে লাগিল। তৈমুরের প্রস্থানের পর দিল্লী নগরীতে দুই মাস কাল দারুণ অরাজকতা বিরাজমান ছিল। পরে ইক্বাল খাঁ নামক একজন পরাক্রান্ত ওমরা রাজধানী অধিকার করিয়া লইলেন। দুর্ভাগ্য মামুদসাহ তৈমুরের ভয়ে গুজরাটে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন; এখন তিনি ভারত-বর্ষ হইতে চলিয়া গেলেন দেখিয়া, দিল্লীতে উপস্থিত হই-লেন। অতঃপর মামুদসাহ কিছুকাল জোয়ানপুরে ও কিছু-কাল কান্যকুব্জে অতিবাহিত করিয়া, দৌলতখাঁ লোদির আনুকূল্যে পুনরায় রাজধানী অধিকার করিয়া লইলেন। এইরূপে তিনি শেষ দশায় সর্ব্বপ্রকার রাজশক্তিবর্জ্জিত হইয়া, ১৪১২ খৃঃঅব্দে প্রাণত্যাগ করিলেন। মামুদের সঙ্গেই তোগলক বংশের লোপ হইল। মামুদের মৃত্যুর পর, দৌল-তখাঁ লোদি দুই বৎসর শূন্য সিংহাসনে আসীন ছিলেন, কিন্তু তিনি রাজোপাধি গ্রহণ করেন নাই। অনন্তর সৈয়দ বংশীয় খিজির খাঁ তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া দিল্লীরাজ্য অধি-কার করিয়া লইলেন। তিনি মুলতানের গবর্ণর ছিলেন। যৎকালে তৈমুর খাঁ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তাঁহার অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। খিজির খাঁ সাত বৎসর

রাজত্ব করিয়া উপরত হইলে, তাঁহার পুত্র মবারকসাহ বার-বৎসর, তৎপরে তাঁহার পৌত্র মহম্মদ আর বারবৎসর অব-শেষে মহম্মদের পুত্র আলাউদ্দিন আটবৎসর কাল রাজত্ব করেন। এই সময়ে লাহোরের গবর্ণর বিলোললোদির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়। তিনি দিল্লীর সিংহাসন আত্মসাৎ করিবার জন্য ইতিপূর্ব্বেই দুইবার উদ্যম করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃত-কার্য্য হইতে পারেন নাই। আলাউদ্দিন এখন তাঁহার প্রভাব সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া, নিজের রাজ্যপাট তাঁহার হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক বদাউন নগরে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে সৈয়দ বংশ ১৪১৪ হইতে ১৪১৫ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া বিলয় প্রাপ্ত হইল। সৈয়দ বংশীয় নৃপতিগণের আমলে দিল্লীসাম্রাজ্যের এমনি দুরাবস্থা হইয়াছিল যে রাজধানীটি পর্য্যন্ত শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করা দুষ্কর হইত।

বিলোললোদি অত্যন্ত কার্য্যতৎপর ও প্রতাপশালী ছিলেন। তিনি রাজাসনে অধিষ্ঠান করিবার পরেই প্রদে-শের গবর্ণরদিগকে স্ববশে আনিতে লাগিলেন। নূতন সম্রাট জোয়ানপুর রাজ্যটি জয় করিবার জন্য উদ্ব্যস্ত হই-লেন, এবং ছাব্বিশ বৎসর একাদিক্রমে সংগ্রাম করিয়া নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারিলেন। জোয়ানপুর দিল্লীর অন্ত-র্ভুক্ত হইল। সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র বারবাক উহার শাসন-কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে বিলোললোদি বাঙ্গালা হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া, ১৪৮৮ অব্দে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তৎপরে দ্বিতীয়

রাজকুমার নিজাম পিতার অভিমত্যানুসারে "সেকেন্দর-সাহ" উপাধি ধারণ পূর্ব্বক রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বারবাক আপত্তি উত্থাপন করাতে দুই ভাই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এই সংগ্রামে সেকেন্দরের জয় হইল। কিন্তু তিনি মুসলমান রাজকুমারদিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করিয়া ভ্রাতাকে মাপ করিয়া জোয়ানপুরের গবর্ণরীপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ১৪৯১ অব্দে সম্রাট জোয়ানপুরের রাজকুলের শেষ বংশধর হোসেনকে পরাজয় পূর্ব্বক; বিহার প্রদেশে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিলেন। ইহার কিঞ্চিৎ পরেই বঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর আলাউদ্দিনের সহিত দিল্লীশ্বরের সন্ধিবন্ধন হইল। ১৫০৩ খৃঃ অব্দে সেকেন্দরসাহ দিল্লী হইতে আগ্রানগরে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় হইতেই আগ্রা মুসলমান ভূপতিগণের রাজধানী হইল। সেকেন্দর মুসলমানধর্ম্মে অত্যন্ত গোঁড়া ছিলেন, এবং হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আঘাত করিতে বিলক্ষণ প্রয়াস পাইতেন। তিনি হিন্দুদের দেবমন্দির সকল উৎখাত করিয়া, তৎসন্নিকটে মসিদ নির্ম্মাণ করিতেন। ১৫১৭ অব্দে সেকেন্দরসাহের পরলোক হইলে, তৎপুত্র ইব্রাহিমলোদি সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। সেকেন্দরসাহের সময়ে মহাপুরুষ চৈতন্যদেব নবদ্বীপে বৈষ্ণব ধর্ম্ম সংস্থাপনে ব্যাপৃত হন। তিনি তন্ত্রমতাবলম্বী শাক্তদিগের ক্রিয়া দেখিয়া নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। প্রেম অর্থাৎ ভক্তিই মুক্তির একমাত্র উপায়, এবং জাতিভেদ কেবল মনুষ্যকল্পিত, যুক্তি ও শাস্ত্রের

অনুমোদিত নহে, এইমত প্রচারার্থ চৈতন্যদেব নানা দেশ পর্য্যটন করেন। অনেকে তাঁহার শিষ্য হয়। অবশেষে চৈতন্যদেব পুরুষোত্তমে গিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় শিষ্যেরা তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া আরাধনা করিতে লাগিল।

ইব্রাহিম অত্যন্ত উদ্ধত ও গর্ব্বিত ছিলেন; তৎপ্রযুক্ত রাজ্যের ওমরাগণ তাঁহার ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার ভ্রাতা জেলালকে জোয়ানপুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিতে যত্নবান হইলেন। কিন্তু জেলাল তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া আপনাকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন এবং ভ্রাতাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। ইব্রাহিম জয়লাভ করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড করিলেন। এই উপলক্ষে তিনি অপরাধীদের প্রতি যেরূপ কঠোর দণ্ডবিধান করিলেন, তাহাতে সকলেই তাহার প্রতি চটিয়া উঠিল। বিহারের গবর্ণর দেরিয়ালোহানি আপনার স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া দিলেন, এবং পঞ্জাবের একজন সর্দ্দার দৌলতলোদি বিদ্রোহ উত্থাপন পূর্ব্বক বাবরকে আহ্বান করিলেন। বাবর ইতি পূর্ব্বেই ১৫২৪ অব্দে লাহোরে নিজ প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ সেকেন্দর সাহের নিজ ভ্রাতা আলাউদ্দিন তাহার উৎসাহে ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতিকূলে অভিযান করিলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হইলেন। অতঃপর বাবর স্বয়ং ১২০০০ সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া পানিপথের দিগে অগ্রসর হইলেন। ইব্রাহিমও এক লক্ষ ফৌজ সংগ্রহ পূর্ব্বক তথায় উপস্থিত

হইলেন। সূর্য্যোদয় হইতে বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত যুদ্ধ হইল। অবশেষে ইব্রাহিমলোদি সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত ও নিহত হইলেন এবং তাঁহার পক্ষের পনের ষোল হাজার ফৌজ রণশায়ী হইল। তখন বাবর সত্বর দিল্লী ও আগ্রানগর অধিকার পূর্ব্বক আপনাকে দিল্লীর অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। এইরূপে লোদিবংশ ১৪৫১ হইতে ১৫২৬ অব্দ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মোগলরাজ্যের আদি বৃত্তান্ত।

বাবর। ১৫২৬—১৫৩০।

মোগল সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা বাবর পিতৃপক্ষে তৈমুর হইতে এবং মাতৃপক্ষে জঙ্গিস খাঁ হইতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি জঙ্গিস খাঁ ও মোগল জাতির প্রতি হেয়জ্ঞান করিতেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তাঁহার বংশাবলী ইতিহাসে ও জনসমাজে মোগল নামেই খ্যাত হইয়াছে। তৈমুর খাঁর বিশাল রাজ্য তাঁহার সন্তানসন্ততিগনের মধ্যে নানা খণ্ডে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে ফর্গণা প্রদেশ বাবরের পিতার অংশে পড়িয়াছিল। বারবৎসর বয়সের সময় পিতৃবিয়োগ হওয়াতে, নিতান্ত শৈশবাবস্থায় তাঁহাকে একটী রাজ্যের ভারবহন করিতে হইয়াছিল। প্রথম হইতেই বাবর অসাধারণ ধৈর্য্য ও বীরত্বের পরিচয় দিতে লাগিলেন। তিনি রাজ্যের উপচয় করিতে যত্নবান হইয়া তৈমুরখাঁর রাজধানী সমরকন্দ তিন তিন বার

অধিকার করিলেন, কিন্তু প্রতিবারই তথা হইতে তাড়িত হইলেন। পরিশেষে জ্ঞাতিবর্গের শত্রুতায় ও দুর্দান্ত অজবেগ জাতির উৎপাতে তাঁহাকে পৈতৃক রাজ্য পর্যান্ত হারাইয়া কিছুকাল বনে বনে ও পর্ব্বতের গুহায় গুহায় বেড়াইতে হইয়াছিল। এই সময়ে তাঁহার এরূপ দৈন্যদশা ঘটিয়াছিল যে, তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্যগণ পর্যান্ত অন্নাভাবে তাঁহার সঙ্গ ছাড়িয়া প্রস্থান করে এবং তিনি একদা মনে করিয়াছিলেন যে সমুদায় আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া চিনদেশে গিয়া সামান্য পৌরজনের ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিবেন। তৎকালে বাবরের বয়স ২৩ বৎসরের অধিক হয় নাই। অতএব তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ধৈর্য্য, প্রফুল্লতা ও উচ্চাভিলাষ তাহার অন্তঃকরণে আবার প্রাদুর্ভূত হইল। তখন তিনি হিন্দুকুশের উত্তর পার দুর্জ্জয় অজবেগ জাতির হস্তগত দেখিয়া একদল সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক কাবুলের দিগে অভিযান করিলেন, এবং বিনাবাধায় উক্ত প্রদেশে নিজ আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন (১৫০৪)।

বাবর কাবুলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নির্বিবাদে কাল কাটাইতে পারেন নাই। চতুষ্পার্শ্বস্থ পার্ব্বতীয় জাতি ও চিরশত্রু অজবেগদিগের উৎপাতে তাঁহাকে সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। পরিশেষে পারস্য রাজের সাহায্যে পুনরায় সমরকন্দ, বুখারা এবং অন্যান্য পৈতৃক রাজ্যবিভাগ অধিকার করিয়া দুই বৎসর ভোগ করেন; কিন্তু পরে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া, তথা হইতে তাড়িত হন। এইরূপে যখন দেখিলেন, যে পৈতৃক রাজ্যপাট স্ববশে

রাখা নিতান্ত অসাধ্য, তখন ভারতবর্ষের দিগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

বাবর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া দেখিলেন যে, দিল্লীর চতুর্দ্দিকে ভিন্ন ভিন্ন ভূপাল ও সর্দ্দারগণ আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন ; বিহার প্রদেশে দেরিয়া লোহানির পুত্র মহম্মদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বাঙ্গালা বিভাগে নাজির সাহ রাজত্ব করিতেছেন, চিতোর ওমালবের পূর্ব্বঅংশ মহাবীর সঙ্গরাজের অধীনস্থ রহিয়াছে এবং চান্দরী রাজ্য মেদিনী রায়ের শাসনাধীন আছে। বাবর প্রথমতঃ মহম্মদকে পরাস্ত করিয়া বিহার প্রদেশ স্ববশে আনিলেন। তদ্দর্শনে গোয়ালিয়র ও ঢৌলপুরের সর্দ্দারেরা আপনা হইতেই তাঁহার অধীনত্ব স্বীকার করিলেন। অতঃ-পর রাজপুতদিগকে প্রতিরোধ করাই প্রধান কার্য্য বলিয়া বোধ হইল। মহাবলপরাক্রান্ত রাণাসঙ্গ ইব্রাহিমলোদির শাসনার্থ ইতিপূর্ব্বে বাবরকে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন দেখিলেন যে, তিনি লোদিরাজকে পরাজয় করিবার পর তৈমুরখাঁর ন্যায় স্বদেশে প্রত্যাগমন না করিয়া দিল্লী সাম্রাজ্য আত্মসাৎ করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। অতএব স্থির করিলেন যে, যাহাতে মুসলমানবংশ ভারতভূমিতে আর বদ্ধমূল হইতে না পারে, তদ্বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে যত্ন-বান হইতে হইবেক। এই বিবেচনা করিয়া সঙ্গরাজ অন্যান্য রাজপুত রাজাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া আগ্রার অনতি-দূরে সিকরি নামক গ্রামে অগ্রসর হইলেন, এবং বাবরের একদল সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিলেন। যদি তিনি এই

অবসরে আলস্য না করিয়া বরাবর অগ্রসর হইতে থাকিতেন, তাহা হইলে বাবরের-ভয়াকুলিত সৈন্যগণ পরাস্ত হইতে পারিত। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া, আপনার সৈন্য সামন্ত অপসারণ পূর্ব্বক কিছুকাল চুপ করিয়া রহিলেন। রাজপুতেরা যেমন সাহসিক ও পরাক্রমশালী, তদ্রূপ কার্য্যতৎপর ও অধ্যবসায়সম্পন্ন নহেন; সেই জন্যেই তাঁহারা কখন সমগ্র ভারতবর্ষে আপনাদের প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিতে পারেন নাই। যাহা হউক, বাবর সেই সুযোগে এক সুদৃঢ় স্থান পছন্দ করিয়া পরিখাদ্বারা বেষ্টিত করিলেন, এবং নিজ ফৌজগণ তথায় স্থাপন পূর্ব্বক তাহাদিগের মনে উৎসাহ জন্মাইয়া দিতে লাগিলেন। ১৫২৭ খৃঃ অব্দের ১৬ ই মার্চ তারিখে দুই দলে আবার সাক্ষাৎ হইল। রাজপুতেরা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া রণ হইতে ভঙ্গ দিল, এবং রাণাসঙ্গ অনেক সর্দ্দারগণকে সমরশায়ী রাখিয়া পলায়ন করিলেন। এইরূপে রাজপুতজাতির নিজ আধিপত্য উদ্ধার করিবার শেষ চেষ্টা নিষ্ফল হইয়া গেল। ভারতভূমিতে মুসলমানদের প্রভুত্ব বজায় রহিল।

ইহার পর ছয়মাসকাল দিল্লীশ্বর রাজ্য শাসনের বন্দোবস্ত করিতে মনোনিবেশ করিলেন। পরবৎসরের প্রারম্ভে তিনি মেদনীরায়কে পরাজয় করিয়া চান্দরী রাজ্য অধিকার করিয়া লইলেন; অযোধ্যাবিভাগ নিরুপদ্রব করিলেন, এবং বিহার হইতে ইব্রাহিমলোদির ভ্রাতা মামুদকে তাড়াইয়া দিলেন। অনন্তর সম্রাট গঙ্গাপার হইয়া বঙ্গাধিপের একদল সৈন্য পরাস্ত করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু বর্ষা উপ-

স্থিত দেখিয়া অবিলম্বে দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিলেন। এখন তাঁহার শরীর বড় সুস্থ ছিল না। উহার উপর আবার যুবরাজ হোমায়ুন ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হইলেন। বৈদ্যেরা নানা চেষ্টার পর একবাক্যে বলিয়া বসিলেন, ইহার রোগ চিকিৎসার অসাধ্য। তখন বাবর অনন্যোপায় হইয়া এদেশীয় লোকের বিশ্বাস অনুসারে বলিয়া উঠিলেন, "আমি আপনার পরমায়ু সমর্পণ করিতেছি ; আমার পুত্র আরোগ্য লাভ করুক।" এই বলিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করত রোগীর শয্যা তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন। তৎপরে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত বলিতে লাগিলেন, "আমার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইয়াছে, আমি এই রোগ লইয়া চলিলাম।" কি আশ্চর্য্যের বিষয় সেই সময় থেকে হোমায়ুন ক্রমশঃ সারিয়া উঠিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার পিতাও দিন দিন ক্ষীণ ও মলিন হইতে লাগিলেন। তখন বাবর পুত্রগণ ও অমাত্যবর্গকে পরস্পর কুশলে ও সদ্ভাবে থাকিবার জন্য উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। (১৫৩০)

মহারাজ বাবর আপনার জীবনচরিত আপনিই লিখিয়া যান। উহার রচনাতে এমনি একটুকু সরলতা ও অমায়িকতা ভাব মাখান, যে একবার পাঠ করিলে সকলেরই মন মোহিত হয়। তিনি বিজিত রিপুর প্রতি সময়ে সময়ে নৃশংসব্যবহার করিতেন, কিন্তু স্বভাবতঃ বড় দয়ালু, অহমিকাহীন, মিষ্টভাষী, প্রফুল্লচিত্ত ও সদালাপী ছিলেন। তাঁহার অবিচলিত সাহস, তাঁহার বিপদ্‌কালে ধৈর্য্য ; অধ্যবসায় ও উৎসাহের যথোচিত স্তুতিবাদ করা অসাধ্য। তিনি কিরূপ পরিশ্রমী

ও কার্য্যতৎপর ছিলেন, তাহা বর্ণনা করিয়া অন্যের হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। তিনি তখন যুদ্ধে ব্যাপৃত না থাকিতেন, মৃগয়া, দেশপর্য্যটন ও নানাপ্রকার ব্যায়াম করিয়া কাল কাটাইতেন। তাঁহার মনও শরীরের মত কর্ম্মঠ ছিল। তিনি রাজ্যতন্ত্রের সমুদায় কার্য্য সমাধা করিয়া অবসর পাইলেই স্থানে স্থানে উৎস, জলাশয়, পয়োনালীখনন প্রভৃতি পূর্ত্তকার্য্যে মনোযোগ দিতেন, এবং দূর দেশের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ফল ফুল প্রভৃতি স্বরাজ্যে আনাইয়া উহার উৎপাদনার্থ ব্যাপৃত হইতেন। ইত্যাদি নানাপ্রকার গুরুতর কার্য্যে নিরন্তর ব্যস্ত থাকিয়াও বাবর পারস্য ও তুরস্ক ভাষায় অনেকানেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পদ্য রচনা করিবার সময় পাইয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল ভূলভিগুণের বর্ণনস্থলে ইহাও উল্লেখ করা উচিত, তিনি অত্যন্ত মদ্যাসক্ত ছিলেন, এবং তন্নিবন্ধনই অকালে কালকবলে পতিত হন।

হোমায়ুন। ১৫৩০—১৫৪০।

হোমায়ুন নামমাত্র ১৫৩০ হইতে ১৫৫৬ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন; কারণ এই সময়ের মধ্যে ষোলবৎসর কাল তাঁহাকে রাজ্যহারা হইয়া নির্ব্বাসিতের ন্যায় কালযাপন করিতে হইয়াছিল। বাবরের আর তিন পুত্র ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেবল কামরাণ পিতার নিকট হইতে কাবুল ও কান্দাহারের শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হন; হিন্দাল ও মির্জা আস্কারির প্রতি রাজ্যতন্ত্রের কোন ভার অর্পিত হয় নাই। কিন্তু হোমায়ুন পাছে ভ্রাতৃগণ তাঁহার অভ্যুদয়ে ক্ষুব্ধ ও ঈর্ষ্যান্বিত হন, এই মনে করিয়া, কামরাণকে উক্ত দুই জনপদ

ব্যতীত পঞ্জাবেরও শাসন কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিলেন এবং হিন্দালকে দিল্লীর পূর্ব্বদিগস্থিত সম্বল প্রদেশের, ও আস্কারীকে মেওয়াত বিভাগের গবর্ণর নিযুক্ত করিলেন। এই কার্য্যটী দ্বারা হোমায়ুনের যেমন উদারতা, তেমনি অবিমৃশ্যকারিতাও প্রকাশ পাইতেছে। কারণ, তাঁহার পিতা কাবুল কান্দাহার প্রভৃতি স্থান হইতে সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক ভারতবর্ষে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন,কিন্তু তিনি ঐ সকল প্রদেশ অন্যদীয় হস্তে সমর্পণ করিয়া, অনেকাংশে আপনার বলের লাঘব করিলেন সন্দেহ নাই।

হোমায়ুনকে প্রথমেই বাহাদুর সাহের বিপক্ষে রণসজ্জা করিতে হয়। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, যে মামুদের সময়ে গুজরাট রাজ্য স্বাধীন হইয়া উঠে। বাহাদুর সাহ গুজরাটের সমুদয় নরপতি অপেক্ষা প্রতাপশালী ছিলেন। খান্দেশ, বিরার ও আহমেদ নগরের রাজারা তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিতেন। ইতিপূর্ব্বেই মালবদেশ জয় করিয়া স্বরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। বাহাদুর কয়েকজন বিদ্রোহীকে আশ্রয় দিয়া হোমায়ুনের বিদ্বেষের আস্পদ হইলেন। এই উপলক্ষে দুই পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইল। বাহাদুর পদে পদে আক্রান্ত ও অনুসৃত হইয়া স্বরাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পর্টুগিজদিগের অধীনস্থ ডিউনামক নগরে আশ্রয় লইলেন। তখন দিল্লীশ্বর মির্জা আস্কারীকে গুজরাটের গবর্ণর নিযুক্ত করিয়া দ্রুতপদে আগ্রায় প্রত্যাগত হইলেন। কিন্তু তিনি পেছন ফিরিতে না ফিরিতেই, বাহাদুর সাহ নিজ দল বল লইয়া, আস্কারীকে দূরীভূত করিয়া আপনার রাজ্যের পুন-

রধিকার করিলেন। হোমায়ুনের তত তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিবার কারণ ছিল। অধুনা মোগলজাতির এক দুর্দান্ত শত্রু প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

সেয়ারখাঁ শূরবংশীয় একজন আফগান। বিহার প্রদেশে তাঁহার এক পৈতৃক জায়গির ছিল! ঐ জায়গির ভোগদখল করিবার এই নিয়ম ছিল যে, যে ব্যক্তি ঐ জায়গিরের উপস্বত্ব ভোগী, তাহাকে যুদ্ধকালে পাঁচশত সৈন্যদ্বারা সাম্রাজ্যের সাহায্য করিতে হইবেক। যৎকালে জোয়ানপুরের অধীশ্বর মহম্মদলোহানি ও বাবরের মধ্যে সংগ্রাম উপস্থিত হয়, সেয়ার খাঁ আপনাকে মোগলরাজের প্রজা বলিয়া ঘোষণা করত লোহানিপতির অধিকারের মধ্যে লুটপাট আরম্ভ করেন। পরে ১৫২৯ খৃঃ অব্দে মহম্মদ লোদি বিহার প্রদেশ অধিকার করিয়া লইলে, সেয়ার তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করেন, কিন্তু লোদিরাজ পরাহত হইলে পর, আবার বাবরের বশতাপন্ন হন। অনন্তর মহম্মদের পরলোক হইলে, তাঁহার নাবালক পুত্র জেলাল, স্বীয় জননীর যত্নে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। এই সময় সুচতুর সেয়ার খাঁ জেলালের কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়া তাঁহার মাতার নিতান্ত বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিলেন। ক্রমে রাজসংসারে তাঁহার এরূপ প্রতিপত্তি হইল যে, রাজ্ঞীর মৃত্যুর পর অবলীলাক্রমে জেলালের উপর কর্তৃত্ব চালাইতে লাগিলেন। সমুদায় রাজকার্য্যেই তাঁহার শাসন খাটিতে লাগিল। অতঃপর তিনি বিহার প্রদেশ স্ববশে আনিয়া চুনারের কেল্লা হস্তগত করিলেন। হোমায়ুন এই সকল সম্বাদ পাইয়া, ভ্রাতৃগণের সহিত বন্দোবস্ত করিবার অব্যবহিতপরেই তাহার বিপক্ষে অভিযান

করেন (১৫৩২)। সেয়ার অগত্যা সম্রাটের বশীভূত হন, কিন্তু অচিরায় তাহাকে বাহাদুরের সহিত সমরে ব্যাপৃত দেখিয়া, বিহার প্রদেশে সম্পূর্ণ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন এবং বাঙ্গালা রাজ্য আক্রমণ পূর্ব্বক উহার রাজধানী গৌড় নগর অবরোধ করিয়া ফেলেন।

হোমায়ুন গুজরাট হইতে প্রত্যাগত হইয়া অবিলম্বে একদল সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া সেয়ারের প্রতিকূলে যাত্রা করিলেন। কিন্তু চুনারের কেল্লা দখল করিবার পর শুনিতে পাইলেন, যে তাঁহার বিপক্ষ গৌড় নগর অধিকার করিয়া বাঙ্গালার অধীশ্বর মামুদকে সর্ব্বতোভাবে পরাজয় করিয়াছেন। তৎকালে সেয়ার খাঁর এমন অভিপ্রায় ছিল না যে, হোমায়ুনের সহিত সম্মুখযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। অতএব শীঘ্র সমুদায় দলবল, ধনসম্পত্তি, ও পরিবারবর্গ সমভিব্যাহারে লইয়া, রোহতস নামক একটি পার্ব্বতীয় কেল্লাতে প্রবেশ পূর্ব্বক নিরাপদে বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে সম্রাট অবাধে গৌড় নগর অধিকার করিয়া দেখিতে পাইলেন, ঘোরতর বর্ষা উপস্থিত,এককালে সব একার্ণব, লোকের গতিবিধি একবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। হোমায়ুন অনন্যোপায় দেখিয়া কয়েকমাস নিতান্ত নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। তাঁহার সৈনিকগণ বর্ষার দাপটে ও রোগের প্রাদুর্ভাবে যৎপরোনাস্তি বিষাদগ্রস্ত হইয়া পালে পালে শিবির পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলাইতে লাগিল। অধিক কি, কুমার হিন্দাল একদল সৈন্য লইয়া বিহারের উত্তরাংশ রক্ষা করিতেছিলেন, তিনি নিজে বর্ষার শেষ না হইতেই প্রস্থান করিলেন।

বিচক্ষণ সেয়ার খাঁ অবসর প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছিলেন। অধুনা নিজ দলবলের সহিত রোহতসের দুর্গ হইতে নির্গত হইয়া একে একে বিহার, বারাণসী ও চুনার অধিকারপূর্ব্বক জোয়ানপুর অবরোধ করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে রাজধানী যাইবার পথ রুদ্ধ হইল দেখিয়া এবং তথায় তদ্বিরুদ্ধে নানা চক্রান্ত চলিতেছে সম্বাদ পাইয়া সম্রাট আগ্রায় প্রত্যাগমন করিবার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন। কিন্তু বক্সার অতিক্রম না করিতেই, তাঁহার দুর্দান্ত শত্রু রাত্রিযোগে আসিয়া হঠাৎ তাঁহার শিবির ঘেরিয়া ফেলিলেন। হোমায়ুনের কেবল ঘোঁড়ায় চড়িয়া নদীতে ঝাঁপ দিবার সময় ছিল। কিন্তু সাঁতার দিয়া পরপারে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই, তাঁহার ঘোঁড়া আক্রান্ত হইয়া জলমধ্যে ডুবিয়া গেল। তিনি জলমগ্ন হইয়া মারা পড়েন, এমন সময়ে একজন ভিস্তি আপনার মোষকে করিয়া পার হইতেছিল। সে তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া প্রাণদান করিল।*

হোমায়ুন নিতান্ত শোচনীয় দশায় আগ্রায় পৌঁছিলেন। তাঁহার সমস্ত সৈন্যের মধ্যে কতক শত্রুর হস্তে প্রাণত্যাগ করিল, কতক বা নদীর গর্ভে নিমগ্ন হইল। সম্রাটের মহিষী শত্রুহস্তে পতিত হইলেন, কিন্তু সেয়ারখাঁ তাঁহার

---

* এই ব্যক্তি পরে আগ্রায় গিয়াছিল। সম্রাট পুরস্কারার্থ তাহাকে অর্দ্ধদিবসের জন্য নিজ রাজ্য পাট প্রদান করেন। ভিস্তি সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া রাজার সমুদায় ক্ষমতা চালায়। কথিত আছে, সে ঐ সময়ের মধ্যে আপনার ও বন্ধুগণের জন্য বিলক্ষণ উপায় করিয়া লইয়াছিল।

প্রতি সাতিশয় সৌজন্য ও উদারতা প্রকাশ করিলেন। এই ভয়ঙ্কর বিপদ্‌পাত ১৫৩৯ অব্দের জুনমাসে ঘটিয়াছিল।

হোমায়ুনের অনুপস্থিতি কালে, হিন্দাল বিদ্রোহ উত্থাপন করিয়াছিলেন এবং কামরাণ আপনার দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার জন্য সসৈন্যে দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করিতেছিলেন। কিন্তু সম্রাট রাজধানীতে উপস্থিত হইবামাত্র এসব গোলযোগ নিবারণ হইয়া গেল। তখন তিন ভাইয়েতে মিলিত হইয়া সেই সাধারণ শত্রুর দমনার্থ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

পরবৎসরের শেষে হোমায়ুন কান্যকুব্জের সন্নিকটে সসৈন্যে ভাগীরথী পার হইয়া শত্রুকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইলেন; এবং অতি কষ্টস্বষ্টে প্রাণ লইয়া পলাইয়া আসিলেন। তখন বিপক্ষের প্রতিরোধ করিবার সমুদয় আশা ফুরাইয়াগেল। সুতরাং তিনি তাড়াতাড়ি নিজ পরিজনবর্গ ও সম্পত্তির সারভাগ সংগ্রহপূর্ব্বক লাহোরে কামরাণের নিকট আশ্রয় লইলেন। কিন্তু কামরাণ সেরার খাঁকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া লাহোর প্রদেশ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার সহিত সন্ধিবন্ধন করিলেন, এবং অবিলম্বে কাবুলে গিয়া নিরাপদে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

হোমায়ুন এইরূপে নিরাশ্রয় হইয়া, প্রথমতঃ সিন্ধুরাজ্য অধিকার করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু সিন্ধুরাজ হোঁসেন আর্গণ অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া, তাঁহার দলবল ছড়িভঙ্গ হইয়া পড়িল এবং তিনি নিতান্ত নিরুপায় হইয়া মাড়োয়ারের ভূপাল মালদেবের শরণাগত হইতে চলিলেন।

কিন্তু যোধপুরের সন্নিকটে পৌঁছিয়াছেন, এমন সময়ে বুঝিতে পারিলেন, যে মালদেব বরং তাঁহাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিতে তৎপর, তাঁহার সাহায্যার্থ যত্নবান নহেন। এই সঙ্কটের সময় দুর্ভাগ্য হোমায়ুন চতুর্দ্দিগ শূন্য দেখিলেন, কিন্তু কি করেন, অগত্যা অমরকোটের অভিমুখেই যাত্রা করিতে হইল। অমরকোট সিন্ধুনদের অদূরে অবস্থিত। এক ভয়ঙ্কর মরু পার না হইলে, তথায় যাইবার উপায় নাই। সিন্ধু হইতে যোধপুরে আসিবার সময় হোমায়ুন দুঃসহ যাতনা পরম্পরা সহ্য করিয়াছিলেন; এখন পদে পদে তদপেক্ষাও দারুণ সঙ্কটে পতিত হইতে লাগিলেন। অবশেষে সকলে অতিশোচনীয় অবস্থায় অমরকোটে উপস্থিত হইলেন। উক্ত জনপদের সর্দ্দার রাণাপ্রসাদ অত্যন্ত সমাদর পূর্ব্বক ভূতপূর্ব্ব সম্রাটের অতিথিসৎকার করিলেন এবং সিন্ধুদেশ জয়ের জন্য সাহায্য করিবেন, প্রতিশ্রুত হইলেন। এই সঙ্কটের মধ্যে হামিদানাম্নী রাজমহিষী একটি পুত্র প্রসব করেন। এরূপ প্রথা আছে যে, ঈদৃশ সময়ে পিতা নিজ বন্ধুবর্গকে উপহার প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু ভূতপূর্ব্ব সম্রাটের তখন এরূপ দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল, যে উপহার দেন, এমন কিছুই তাঁহার নিকটে ছিলনা, কেবল একটী মৃগনাভির থলে ছিল। তিনি উক্ত শুভ সম্বাদ পাইয়া, সেই থলেটী ছিড়িয়া ফেলিলেন এবং এই কামনা করিয়া সঙ্গীগণের মধ্যে মৃগনাভি বিতরণ করিতে লাগিলেন যে, "যেন উহার গন্ধের ন্যায় আমার নবকুমারের যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিগে বিস্তারিত হয়।" তাঁহার এই পুত্রের নাম জেলালদ্দি

মহম্মদ। ইনি পরে আকবরসাহ নামে ভুবনে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

অনন্তর হোমায়ুন রাণাপ্রসাদের সাহায্যে পুনর্ব্বার সিন্ধুরাজ্য অধিকার করিতে প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য না হইয়া, কান্দাহার স্ববশে আনিতে উদ্যুক্ত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা মির্জা আস্কারী তৎকালে কামরাণের অধীনে উক্ত নগরে প্রভুত্ব করিতেছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠের কুমতলব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে বন্দী করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কিন্তু হোমায়ুন এই সম্বাদ পাইয়া, চল্লিশ জন মাত্র সঙ্গী সমভিব্যাহারে লইয়া দ্রুতপদে পারস্য দেশে পলায়ন করিলেন। তাঁহার নবকুমার ও অন্যান্য স্বজনবর্গ আস্কারীর হস্তে পতিত হইল। (১৫৪৩ খৃঃ অব্দ)।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শূরবংশ। ১৫৪০—১৫৫৬।

কামরাণের প্রস্থানের পর সেয়ার খাঁ পঞ্জাব বিভাগে এক জন গবর্ণর নিযুক্ত করিয়া আগ্রায় প্রত্যাগমন করিলেন। পরবৎসর (১৫৪১) তিনি মালব দেশ স্ববশে আনয়ন পূর্ব্বক রায়সিন নামক কেল্লা অবরোধ করিলেন। অবরুদ্ধ সৈনিকগণ সম্রাটের নিকট অভয়দানের আশ্বাস পাইয়া, তাঁহার হস্তে দুর্গ সমর্পণ করিল। কিন্তু তিনি নিজ অঙ্গীকার অস্বীকারপূর্ব্বক, তাহাদিগকে অকাতরে সংহার করিলেন। এই হত্যাকাণ্ড ইতিহাসে একটী ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা ও

নৃশংসতার কর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ১৫৪৩ অব্দে সম্রাট আশি হাজার ফৌজ লইয়া মাড়োয়ার রাজ্য আক্রমণ করিলেন। রাজা মালদেবও পঞ্চাশ হাজার সৈন্য, সমভিব্যাহারে প্রথমতঃ অগ্রসর হইলেন, কিন্তু সেয়ার সাহের কুটলেখাদ্বারা আপনার অধীনস্থ সর্দ্দারগণের প্রতি সন্দিহান হইয়া পাছু হটিয়া চলিলেন। একজন রাজপুত সর্দ্দার প্রভুর অকারণ অবিশ্বাসে রোষপরবশ হইয়া আপনার দল বলের সহিত ভয়ঙ্কর বেগে যবনসেনা আক্রমণ করিলেন। তিনি প্রায় জয়লাভ করেন, এমন সময়ে সম্রাট অতিকষ্টেস্বষ্টে তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন যে, "আমি এক মুষ্টি মেড়ুয়ার * অনুরোধে এখনি আপনার সাম্রাজ্য হারাইয়াছিলাম।"

অনন্তর তিনি মেওয়ারের রাণাকে বশীভূত করিয়া সুপ্রসিদ্ধ কালিঞ্জরের দুর্গ অবরোধ করিলেন। কালিঞ্জরের রাজা, রায়সিনের কেল্লার আক্রমণকালীন তাঁহার ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা স্মরণ করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি বন্ধন করিতে কোন মতে সম্মত হইলেন না। অতএব সেয়ার সাহ দ্বিগুণতর বিক্রম সহকারে অবরোধ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে গাগিলেন। একদা যেমন তোপশ্রেণী যথাস্থানে স্থাপিত হইয়াছে কিনা দেখিবেন, অমনি বিপক্ষ কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত একটা জ্বলন্ত গোলা বারুদখানায় পড়াতে চতুর্দ্দিগ অগ্নিময় হইয়া উঠিল।

---

* মাড়োয়ার দেশের অনুর্ব্বরতা প্রসিদ্ধ, সেয়ারসাহ উহা মনে করিয়াই এই ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছিলেন।

তিনি দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঝল-সিয়া গেল। তথাপি তিনি সেই ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার মধ্যেও অবরোধের কার্য্য সকল তত্ত্বাবধারণ করিতে লাগিলেন, এবং যখন সম্বাদ পাইলেন, যে কেল্লা দখল হইয়াছে, অমনি বলিয়া উঠিলেন "হে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর! তোমারে ধন্য।" ইহার পর তাঁহার কণ্ঠ হইতে আর বাক্যের স্ফূর্ত্তি হইল না। তখন পার্শ্ববর্ত্তী অনুচরেরা জানিতে পারিল, সম্রাট মানব-লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। (১৫৪৫)।

সেয়ারসাহ যেমন কার্য্যদক্ষ, তেমনি বিমৃশ্যকারী ছিলেন; এবং কোথায় সাহস প্রকাশ করিতে হয়, কোথায় বা সতর্ক ভাবে চলিতে হয় বিলক্ষণ জানিতেন। যদিও দুরাকাঙ্ক্ষার প্রভাবে সময়ে সময়ে অনেক অবৈধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া-ছিলেন, তথাপি প্রজাপুঞ্জের হিতের নিমিত্ত যে সকল সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার দয়াগুণ ও বহুদর্শিতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তিনি পাঁচবৎসরকালমাত্র রাজত্ব করিতে পাইয়াছিলেন, এবং সেই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই নিরন্তর সমরকর্ম্মে ব্যাপৃতছিলেন। তথাপি যাহাতে শাসন-কার্য্যের সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয়, তন্নিমিত্ত অনেক সুনিয়ম স্থাপিত করেন। তাঁহার রাজ্যের সমুদায় বিভাগে শান্তিও সুশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাজপথ হইতে দস্যুভয় এক-বারে অন্তর্হিত হইয়া যায়; সেয়ার সাহ এদেশে ঘোড়ার ডাকের সৃষ্টি করেন এবং বঙ্গদেশ হইতে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত একটি সুপ্রশস্ত বর্ত্ম নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পথিকগণের বিশেষ সুবিধা করিয়াদেন। ঐ পথের উভয়পার্শ্বে পাদপশ্রেণী রোপিত

হয়। আড্ডায় আড্ডায় সরাইখানা স্থাপিত এবং দেড়-মাইল অন্তর এক একটী কূপ নিখাত হয়।

সেয়ারসাহের মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র ইস্লামসাহ, সাত-বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি বিলক্ষণ কার্য্যদক্ষ ছিলেন এবং পিতার ন্যায় রাজ্যের হিতার্থ ব্যাপৃত হইতেন। তৎপরে তাঁহার শ্যালক তদীয় নাবালক পুত্রকে সংহার করিয়া মহম্মদ আদিল সাহ উপাধি ধারণ পূর্ব্বক সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তিনি নিজে নিতান্ত মুর্খ ও নীচ প্রকৃতির লোক ছিলেন, বিশ্বস্ত উজির হিমুকে রাজকার্য্যের তাবৎ ভার সমর্পণ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়সেবায় নিমগ্ন হইলেন। হিমু জাতিতে হিন্দু ছিলেন, এবং যদিও নিতান্ত নীচ বংশোদ্ভব, চিররোগী ও দেখিতে কদাকার, তথাপি সাহসী, কার্য্যতৎপর ও সমরনিপুণ ছিলেন। ১৫৫৫ অব্দে ইব্রাহিম শূর নামে এক ব্যক্তি আদিল সাহকে তাড়াইয়া দিয়া দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়া লইল, কিন্তু অবিলম্বে সেকেন্দর নামক আর একজন শূরবংশীয় পুরুষ তাহাকে বিদ্রাবিত করিয়া উক্ত দুই নগর আত্মসাৎ করিয়া ফেলিল। মহম্মদ শূর বাঙ্গালাতে ও সুজা খাঁ মালবে স্বাধীন হইবার জন্য প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। হিমু দুর্ব্বৃত্ত ইব্রাহিমকে পরাস্ত করিয়া, বাঙ্গালার দিগে অভিযান করিতেছেন, এমন সময়ে সম্বাদ পাইলেন, হোমায়ুন সেকেন্দর শূরকে পরাজয় পূর্ব্বক দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই নিরুৎসাহ না হইয়া প্রথমতঃ মহম্মদশূরকে সমরক্ষেত্রে সংহার করিলেন, পরে কার্য্যবিধুর প্রভুকে চুনারের কেল্লাতে

সংস্থাপন পূর্ব্বক আগ্রার উদ্দেশে প্রয়াণ করিবার নিমিত্ত উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

হোমায়ুন পারস্য রাজ্যে পৌঁছিয়া বহু সমাদরে ও সমৃদ্ধি সহকারে সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে ধর্ম্ম-সংক্রান্ত কথা লইয়া পারস্যরাজ্যের সহিত তাঁহার অকৌশল ঘটিত। সাহ তমাস্প সিয়াধর্ম্মের গোঁড়া ছিলেন, যে কোন প্রকারে হউক উহার শ্রীবৃদ্ধি ও সুন্নিধর্ম্মের * বিলোপ হয়, তদ্বিষয়ে নিরন্তর যত্নবান ছিলেন। সম্প্রতি হোমায়ুনকে উক্ত ধর্ম্ম পরিগ্রহ করাইবার জন্য যৎপরোনাস্তি পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অবশেষে হোমায়ুন অগত্যা, সিয়াধর্ম্ম নিজে অবলম্বন করিলেন ও রাজ্যমধ্যে প্রচার করিয়া দিবেন, প্রতিশ্রুত হইয়া পারস্য রাজের নিকট হইতে ১৪০০০ অশ্ব-সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক কান্দাহার নগর অধিকার করিয়া লইলেন এবং উহার গবর্ণর মির্জা আস্কারীকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। এই সময় থেকে অনেকানেক সৈনিক পুরুষ আসিয়া তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিতে লাগিল। বোধ

* মুসলমানেরা সিয়া ও সুন্নি এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। মুসলমান ধর্ম্মের স্থাপনকর্ত্তা মহম্মদের মৃত্যুর পর, তিন জন ব্যক্তি খলিফা অর্থাৎ প্রধান পুরোহিতের পদে অভিষিক্ত হন। তৎপরে তাঁহার জামাতা আলি তৎপদে অধিরোহণ করেন। ঐ তিনজন খলিফার সঙ্গে মহম্মদের কোন সম্পর্ক ছিল না। তৎপ্রযুক্ত সুন্নিরা তাঁহাদিগকে প্রকৃত খলিফা বলিয়া স্বীকার করেন না, প্রতারক বলিয়া অবজ্ঞা করেন। কিন্তু সিয়াদের মতে তাঁহারা প্রকৃত খলিফা, প্রতারক নন। সিয়ারা কেবল কোরাণকে ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া গ্রাহ্য করেন! কিন্তু সুন্নিরা তদ্ভিন্ন মহম্মদের বাচনিক উপদেশ সকলকেও কোরাণের ন্যায় অনু-লঙ্ঘনীয় বলিয়া মানেন।

হইল, বুঝি ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি আবার মুখ তুলিয়া চাহিবেন। ইহার পর হোমায়ুন ছয় বৎসর কাল কাবুলের অধিকার লইয়া কামরানের সহিত বিরোধে ব্যাপৃত থাকিলেন। পরিশেষে ১৫৫১ অব্দে ঐ প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে স্ববশে আনয়ন পূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসন পুনরুদ্ধারের জন্য অবসর প্রতিক্ষা করিয়া রহিলেন। অনন্তর দিল্লীরাজ্যের বিশৃঙ্খলতা দর্শনে প্রোৎসাহিত হইয়া, ১৫৫৫ অব্দের প্রারম্ভে ১৫ হাজার ফৌজ সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রথমতঃ পঞ্জাব বিভাগ অধিকার করিয়া লইলেন। পরে সরহিন্দ নগরে সেকেন্দর শূরকে পরাজয় করিয়া দিল্লী ও আগ্রা নগরে নিজ প্রভুত্ব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

এইরূপে হোমায়ুন নিজ রাজধানীর পুনরধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু অধুনা তাঁহার ভূতপূর্ব্ব রাজ্যের অতি অল্প অংশ মাত্র হস্তগত হয়, এবং দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি উহা ব্যাপক কাল ভোগ করিতে পান নাই। দিল্লীতে প্রত্যাগত হইবার পর, ছয়মাস কাল অতীত না হইতেই, এক দিন উপরের সিড়ি হইতে যেমন নামিবেন, অমনি স্খলিতপদ হইয়া এরূপ আহত হইলেন যে, চারিদিনের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিলেন।

হোমায়ুন সাহসী ও রণনিপুণ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার দ্বৈধ ও দীর্ঘসূত্রিতা নিবন্ধন সকলই বিফল হইয়া যায়। তথাপি তিনি কোন কার্য্যে একবার মতলব আটিয়া উদ্যম করিতে পারিলে, বিলক্ষণ অধ্যবসায় ও উৎসাহ সহকারে উহার সমাধা করিতে প্রয়াস পাইতেন। তিনি বদান্য ও সদাশয়

ছিলেন, কিন্তু তাদৃশ বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করিতে পারিতেন না। কামরাণের বারম্বার বিশ্বাসঘাতকতা নিবন্ধন কুপিত হইয়া তাঁহার প্রতি যে দারুণ দণ্ড * বিধান করেন, উহা নিতান্ত নিষ্ঠুরের কার্য্য এবং পারস্যরাজ সাহ তমাস্পের মৃত্যুর পর অঙ্গীকার ভঙ্গ পূর্ব্বক, তাঁহার সৈনিকগণকে তাড়াইয়া দিয়া যে কান্দাহার নগর অধিকার করিয়াছিলেন, উহা সাতিশয় বিশ্বাসঘাতকতার কর্ম্ম ; তথাপি তিনি স্বভাবতঃ নৃশংস ও প্রতারক ছিলেন না। হোমায়ুন বিপদকালে যেরূপ ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা প্রকাশ করেন, উহার দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তের মধ্যে কেবল তাঁহার পিতার জীবনচরিতেই দৃষ্ট হয়।

আদিলসাহের প্রধান মন্ত্রী হিমু হোমায়ুনের মৃত্যু সম্বাদ পাইয়া দ্রুতপদে অভিযান পূর্ব্বক আগ্রা ও দিল্লী হইতে মোগলদিগকে তাড়াইয়া দিলেন এবং অবিলম্বে লাহোরের দিগে ধাবমান হইলেন। তৎকালে যুবরাজ আকবর, বৈরাম খাঁর সহিত একদল ফৌজ লইয়া সেকেন্দর শূরের প্রতিকূলে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার সৈন্য মধ্যে সকলেই এইমত, যে হিমুর সহিত আপাততঃ যুদ্ধ না করিয়া কাবুলে প্রত্যাগমন করাই শ্রেয়স্কল্প। কিন্তু তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত না

* কামরাণের দুই চক্ষু ছুরিকার আঘাতে ক্ষত বিক্ষত করিয়া উহাতে লেবুর রস ও লবণ রগড়াইয়া দেওয়া হয়। কামরাণ করুণস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "হে জগদীশ হে প্রভো ? যে সকল পাপ কর্ম্ম করিয়াছি, ইহকালে তাহার সম্পূর্ণ ফলভোগ করিলাম, কিন্তু নাথ দেখ যেন অন্তে আমার প্রতি কৃপা থাকে।

করিয়া বৈরামের উপর সমুদয় ভার অর্পণ করিলেন। বৈরাম শত্রু অপেক্ষা হীনবল হইয়াও অকুতোভয়ে পানিপথে অগ্রসর হইলেন, এবং সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া দুর্দ্ধর্ষ পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে হিমুও সাহসের একশেষ প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু পরিশেষে সর্ব্বতোভাবে পরাজিত ও বন্দীকৃত হইলেন। ভারতবর্ষের সাম্রাজ্য হইয়া পাঠান ও মোগল জাতির মধ্যে যে এতকাল বিরোধ চলিতেছিল, এই সংগ্রামে উহার অবসান হইল; এবং দিল্লীর সিংহাসনের অধিকারার্থ মোগল জাতির আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রহিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মোগল সাম্রাজ্যের অসাধারণ অভ্যুদয়।

আকবর সাহ। ১৫৫৬—১৬০৫

যখন আকবর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম তের বৎসরমাত্র। সুতরাং রাজ্যতন্ত্রের সমুদয় ভার প্রথমে বৈরাম খাঁর হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। তিনি হোমায়ুনের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন ছিলেন। সেয়ার খাঁর প্রলোভন বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া, অনেক কষ্টের পর তিনি সিন্ধুদেশে আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হন। তার পর কখন তাঁহার সঙ্গছাড়া হন নাই, নিয়তই তাঁহার সঙ্কট ও

সংগ্রাম পরম্পরায় সমদুঃখসুখী হইয়াছিলেন। যৎকালে আকবর রাজপদ প্রাপ্ত হন, তখন কেবল দিল্লী ও আগ্রার চতুর্দ্দিগস্থ জনপদ গুলি এবং পঞ্জাব প্রদেশ তাঁহার স্ববশে আসিয়াছিল। তদ্ভিন্ন সাম্রাজ্যের আর সকল প্রদেশ—গুজরাট, খান্দেশ, বাঙ্গালা, জোয়ানপুর, সিন্ধু ও মুলতান—সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল; এবং কাবুল মির্জাসলিমানের হস্তগত হইয়াছিল। বৈরামের রণনৈপুণ্য ও অনিবার্য্যশাসন প্রথমে আকবরের পক্ষে বড়ই আবশ্যক ছিল। ১৫৬৯ অব্দে আজমীর প্রদেশ বিনাযুদ্ধে অধিকৃত হইল। উহার পরবৎসর গোয়ালিয়ারের দুর্গ এবং জোয়ানপুর পর্য্যন্ত প্রদেশ জয় করা হইল। এইরূপে যে পর্য্যন্ত নবার্জিত মোগলরাজ্যের সুশৃঙ্খলা ও দৃঢ়তা সমাহিত না হয়, আকবর ও তাঁহার ওমরাগণ বৈরামের অত্যাচার, দর্পিত ব্যবহার ও কঠোর শাসন কষ্টস্বষ্টে সহ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু এতদিনে কিছুতেই তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল না দেখিয়া, সুবিচক্ষণ আকবর এক দিন তাঁহার অনুপস্থিতিরূপ সুযোগে এই ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, এখন রাজতন্ত্রের সমুদয় ভার সম্রাট স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন; কেহই যেন আর কোন ব্যক্তির আজ্ঞা না শুনে। বৈরাম এই সম্বাদ পাইয়া নানা কল্পনা করিতে লাগিলেন, পরিশেষে বিদ্রোহ উত্থাপনপূর্ব্বক পঞ্জাব প্রদেশ অধিকার করিতে প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু সত্বর পরাস্ত হইয়া, সম্রাটের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। তিনি তাঁহার সমুদয় অপরাধ মার্জ্জনা পূর্ব্বক বহু সমাদরে সম্বর্দ্ধনা করিয়া বলিলেন, হয় আপনি কোন

প্রদেশের শাসন কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করুন অথবা সচিবত্বপদে ব্রতী হউন, না হয় মানপূর্ব্বক বিদায় লইয়া মক্কার উদ্দেশে তীর্থ যাত্রা করুন। বৈরাম স্বভাবতঃ মনস্বী ও পরিণামদর্শী ছিলেন,সুতরাং শেষকল্প সমীচীন ভাবিয়া গুজরাটে প্রস্থান করিলেন, কিন্তু তথা হইতে মক্কায় গমন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ একজন আফগানের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলেন। (১৫৬০)

যদিও আকবর স্বাতন্ত্র্য লাভ করিলেন, তাঁহার পক্ষে রাজপদ বজায় রাখা বড় দুরূহ ব্যাপার হইল। আফগান ও রাজপুত উভয়েই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ; তাঁহার যে পৈতৃক মোগলসৈন্য ছিল, তৎসাহায্যে সকলকে বলপূর্ব্বক অধীনস্থ রাখা অসম্ভব। মহারাজ আকবরসাহ এই প্রকার বিশ্বাসের পরবশ হইয়া এবং স্বভাবসিদ্ধ উদারতা ও সাধুতা গুণে উত্তেজিত হইয়া, বিজিত জাতির প্রতি সতত সদয় ও পক্ষপাতশূন্য ব্যবহার করিবেন, এবং অবসর পাইলেই তাহাদের গুণের পুরস্কার ও রাজকার্য্যে নিয়োগ করিবেন, এরূপ স্থির করিলেন। মোগলবংশ যে দিল্লীর সিংহাসনে ইহার পর দুই শত বৎসরেরও অধিক কাল প্রতিষ্ঠিত ছিল, উহা আকবরসাহের এই সুনীতিরই একমাত্র ফল।

১৫৬১ অব্দে সম্রাট মালবদেশ জয় করিলেন, এবং উহার সর্দ্দার রাজবাহাদুরকে রাজসংসারে একটী কর্ম্ম প্রদানপূর্ব্বক অনেকাংশে তাঁহার মনঃপীড়া দূর করিতে পারিলেন।

অতঃপর আকবরসাহ ওমরাদিগের বিদ্রোহে ব্যতিব্যস্ত হন, কিন্তু সাত বৎসর কাল একাদিক্রমে তাঁহাদিগের সহিত

সংগ্রাম করিয়া সর্ব্বতোভাবে শান্তিবিধান করেন। ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তাঁহার ভ্রাতা মির্জাহাকিম, তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিব্রত দেখিয়া, পঞ্জাব আক্রমণ করেন, কিন্তু তথা হইতে শীঘ্র তাড়িত হইয়া কাবুলে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক শত্রুর হস্ত হইতে উক্ত প্রদেশ উদ্ধার করিয়া লন। এইরূপে আকবর নিজ পরাক্রমপ্রভাবে শত্রুগণকে দমন করিয়া এবং সদয় ব্যবহার গুণে তাহাদের মধ্যে অনেকের ভক্তিভাজন হইয়া পৈতৃক রাজ্যপাট দৃঢ়ীভূত করিলেন। কিন্তু তখনও তাঁহার বয়ঃক্রম পঁচিশ বৎসরের অধিক হয় নাই।

অধুনা সম্রাট ভারতবর্ষের অন্যান্য বিভাগে আধিপত্য স্থাপন করিবার নিমিত্ত উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ রাজপুতনাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য হইল। মহাবীর সঙ্গরাজের পুত্র উদয় সিংহ অধুনা চিতোরের সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। তিনি দিল্লীশ্বরকে অগ্রসর দেখিয়া রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্যময় পার্ব্বতীয় ভূভাগে গিয়া আশ্রয় লইলেন। অতঃপর চিতোরনগর বীরবর জয়মাল কর্ত্তৃক কিছুকাল রক্ষিত হইয়া, শত্রুহস্তে পতিত হইল। উদয়সিংহের পুত্র প্রতাপসিংহ কয়েক বৎসর রাজ্যছাড়া হইয়া সিন্ধুতীরে গুপ্তভাবে কালযাপন করেন, কিন্তু আকবরের মৃত্যুর পূর্ব্বে পৈতৃক রাজ্যের কিয়দংশ উদ্ধার করিয়া লইয়া উদয়পুরে নিজ রাজধানী স্থাপিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। উদয়পুরের রাজারা আভিজাত্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা কদাপি দিল্লীশ্বরের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে লিপ্ত হন নাই। প্রত্যুত যে সকল রাজপুতভূপতিরা তাহাতে সম্মত হইয়া-

ছিলেন, তাঁহাদের বংশাবলীর সঙ্গে আহার ব্যবহার পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। দূরদর্শী আকবর রাজপুতদিগকে বিবাহসূত্রে সংবদ্ধ করিতে সাতিশয় উৎসুক ছিলেন। তিনি নিজে জয়পুর ও যোধপুরের রাজকুমারীদের পাণিগ্রহণ করেন। যোধপুরের রাজকন্যার গর্ভে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিমের জন্ম হয়। সেলিম আবার মানসিংহের ভগিনীকে বিবাহ করেন। রাজপুত রাজগণ সম্রাটের সদ্ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া মোগলবংশের প্রতি সবিশেষ অনুরক্ত হইয়া উঠেন, এবং যে পর্য্যন্ত না আরঙ্গজীবের গোঁড়ামিতে মর্ম্মান্তিক বেদনা প্রাপ্ত হন, প্রাণপণে আকবরের উত্তরাধিকারিগণের আনুকূল্য করিয়াছিলেন।

অনন্তর সম্রাট রন্তিমপুর ও কালিঞ্জরের প্রসিদ্ধ দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন। এই সময়ে যোধপুরের রাণা মালদেবের সহিত তাঁহার অকৌশল ঘটিল, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সম্রাটের বশীভূত হইয়া নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

তৎকালে গুজরাট রাজ্যে মহা গোলযোগ চলিতেছিল। মজঃফর সাহ নামমাত্র রাজ্যেশ্বর; কিন্তু চঙ্গিষ খাঁ ও মির্জাদের উৎপাতে দেশ ছারখার হইতেছিল। অবশেষে ১৫৭২ অব্দে মজঃফরের উজির হটিমাদ খাঁ আকবরের নিকট এই প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন যে, আপনি এই রাজ্য স্বহস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক সমুদয় উপদ্রব শান্তি করুন। তখন আকবর নিজে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। মির্জারা * ও আপনাদের

* মির্জারা আকবরের জ্ঞাতি ছিলেন

দল বল লইয়া তাঁহাকে প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত উদ্যুক্ত হইল। এই উপলক্ষে সম্রাট একদা ১৫৬ জন মাত্র যোদ্ধা লইয়া বিপক্ষের একহাজার ফৌজ আক্রমণ করেন; তাহা-রাও তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলে। যদ্যপি জয়পুরের রাজা ভগ-বান সিংহ ও তাঁহার পোষ্যপুত্র মানসিংহ তাদৃশ বিক্রম প্রকাশ না করিতেন, তাঁহার রক্ষা পাওয়া দুর্ঘট হইত। যাহা হউক অবিলম্বেই বিপক্ষগণ সর্ব্বত্র পরাভূত হইতে লাগিল এবং গুজরাট রাজ্য আকবরের বশীভূত হইল। তথাপি তথায় মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইত। পরিশেষে ১৫৯৩ অব্দে মজঃফর সাহ সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া আত্মহত্যা করিলেন; তদবধি উক্ত প্রদেশ সর্ব্বতোভাবে নিরুপদ্রব হইল।

অনন্তর সম্রাট বাঙ্গালাদেশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি-লেন। বাঙ্গালার অধীশ্বর দায়ুদ খাঁ ইতিপূর্ব্বে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, যে দিল্লীশ্বরকে যথানিয়মে কর প্রদান করিবেন কিন্তু অধুনা তাহা অস্বীকার করিলেন। সুতরাং আকবরকে তদ্বিপক্ষে রণসজ্জা করিতে হইল। দায়ুদ পদে পদে পরা-জিত হইয়া প্রথমতঃ উড়িষ্যায় পলায়ন করিলেন, কিন্তু সত্বর সুযোগ পাইয়া আবার বঙ্গদেশে উপস্থিত হইয়া স্থানে স্থানে মোগলসৈন্যকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর আকবরের সেনাপতি খাঁ-জিহান ও রাজা তোদরমল্ল ১৫৭৬ অব্দে আকমহল নামক গ্রামের সন্নিকটে তাঁহাকে রণে পরাজিত ও নিহত করিলেন। উক্ত ঘটনার দুই বৎসর পরে বাঙ্গালা প্রদেশ রীতিমত দিল্লী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

তথাপি মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহ উত্থাপিত হইত। ১৫৮৯ অব্দে রাজা মানসিংহ বাঙ্গালা বিভাগের গবর্ণর নিযুক্ত হইলেন এবং উড়িষ্যার আফগানগণের দলপতি কুতুলু খাঁকে পরাস্ত করিলেন। ১৬০০ অব্দে কুতুলু খাঁর পুত্র অসমান খাঁ বিদ্রোহ উত্থাপন করিল, কিন্তু সে সহজেই পরাস্ত হওয়াতে বাঙ্গালা বিভাগে শান্তি স্থাপন হইল। ঐ সময় থেকেই হিন্দুস্থান হইতে আফগান জাতির আধিপত্যের শেষচিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া যায়।

১৫৮৭ অব্দে সম্রাট কাশ্মীর প্রদেশ অধিকার করিয়া লন, এবং কাশ্মীরের অধিপতিকে ওমরাপদে অভিষিক্ত করিয়া, তাঁহার পোষণার্থ বিহারে একটী জায়গির প্রদান করেন। কাশ্মীরের জলবায়ু স্বাস্থ্যের পক্ষে এত অনুকূল ও দৃশ্য এত মনোহর, যে ইহাকে পৃথিবীর মধ্যে স্বর্গ বলিয়া বর্ণন করা হয়। আকবর সাহ তাঁহার রাজত্বের মধ্যে কেবল আর দুইবার কাশ্মীরে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পর দিল্লীর সম্রাটেরা প্রতিবৎসর তথায় অবস্থিতি পূর্ব্বক গ্রীষ্ম-কাল অতিবাহিত করিতেন।

এই সময়ে আকবর সাহ আফগানিস্থানের পর্ব্বতবাসী জুজুফজি এবং রোষিণীয় জাতির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। এই যুদ্ধে তাঁহার পরম প্রেমাস্পদ বীরবল একদল সৈন্যের সহিত পর্ব্বতের কন্দরে রুদ্ধ হইয়া নিধন প্রাপ্ত হন। এই সংবাদে চতুর্দ্দিগস্থ লোক ভয়ে বিহ্বলিত হইল এবং আকবরের স্নিগ্ধ অন্তঃকরণ বন্ধুর শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িল। উক্ত ঘটনার আড়াই শত বৎসর পরে

জেলালাবাদের সন্নিকটে ইংরাজদিগের ও এইরূপ ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল। অনন্তর তোদেরমল ও মানসিংহ উক্ত দুই পার্ব্বতীয় জাতির বিপক্ষে প্রেরিত হইলেন। তাঁহারা একাদিক্রমে পনর বৎসর কাল সংগ্রাম করিয়া উহাদিগকে পদে পদে পরাজয় পূর্ব্বক অনেকাংশে বশীভূত করিতে পারিয়াছিলেন।

১৫৯২ খৃঃ অব্দে সিন্ধুদেশ সম্রাটের হস্তগত হইল; তিনি সিন্ধুরাজকে ওমরা পদে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহাকে তত্তা-বিভাগের শাসন কর্ত্তৃত্ব অর্পণ করিলেন।

১৫৮৫ অব্দে আকবরের ভ্রাতা মির্জা হাকিম পরলোক গমন করিলে পর, তিনি কাবুল প্রদেশ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অধিকার করিয়া লন। সেই সময় হইতে কান্দাহার আত্মসাৎ করিবার জন্য তাঁহার চেষ্টা ছিল। অনন্তর সম্রাট সিন্ধু-রাজ্য জয় করিবার দুই বৎসর পরে, সুযোগ পাইয়া কান্দাহার নগর ও উহার অন্তর্ভুক্ত জনপদ অধিকার করিলেন। এই সম্বাদে পারস্যের অধিপতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু আপাততঃ মনের বেদনা মনেই নির্ব্বাণ করিয়া রাখিলেন। এইরূপে মহারাজ আকবর সমুদয় হিন্দুস্থানে ও সিন্ধুর পরপারস্থিত সমস্ত পৈতৃক অধিকারে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন। উদয়পুরের রাণা তখনও পরাজিত হন নাই, তথাপি অন্যান্য রাজপুত ভূপালেরা তাঁহার সম্পূর্ণ বশীভূত ও অনুরক্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি দাক্ষিণাত্যের দিগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মহম্মদ তোগলকের রাজত্ব

কালে বামনি নামক একটি মুসলমান রাজ্য এবং বিজয়নগর ও তৈলঙ্গ নামক দুইটী হিন্দুরাজ্য স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছিল। এই তিনটী রাজ্যের অধিপতিরা একবাক্য হইয়া দিল্লীশ্বরের বিপক্ষে আত্মরক্ষা করিতে উদ্যুক্ত হন। কিন্তু দিল্লীশ্বরের ক্ষমতা নিতান্ত খর্ব্ব হইলে পর, পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করেন। বামনি রাজ্য ১৭১ বৎসর কাল স্থায়ী হইয়াছিল; পরে তাহার ধ্বংসাবশেষ হইতে বিজয়পুর, আমেদনগর, গোলকন্দ, বিরার ও বিদর্ভ এই পাঁচটী মুসলমান রাজ্য উত্থিত হয়। বিজয়নগরের রাজারা প্রবল প্রতাপান্বিত ছিলেন এবং বরাবর সমকক্ষ হইয়া মুসলমান ভূপালদিগের সহিত সন্ধি বিগ্রহ কার্য্যে ব্যাপৃত হইতেন। কালক্রমে যবনরাজারা উক্তরাজ্যের ঐশ্বর্য্য দর্শনে ঈর্ষাপরবশ হইয়া সকলে মিলিত হইয়া ১৫৬৫ অব্দে রাম রাজকে আক্রমণ করিলেন। কৃষ্ণা নদীর তীরে তালীকোট নগরের ক্ষেত্রে এক ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইল। বর্ষীয়ান রামরাজা পৌরুষের এক শেষ প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু পরিশেষে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়া শক্রর হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলেন। জেতারা পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা বশতঃ এই জয়দ্বারা কিছুই লাভ করিতে পারিলেন না। সুতরাং বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষ হইতে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উৎপত্তি হইল। তৎসমুদয়ের মধ্যে চন্দ্রগিরির অধিপতি বিজয়নগরের রাজ বংশীয় ছিলেন। ইনিই ইংরাজদিগকে বাণিজ্যার্থ আহ্বান পূর্ব্বক মান্দ্রাজ নামক একটী পল্লী প্রদান করেন। ঐ সময়ে গোলকন্দের অধীশ্বর তৈলঙ্গ রাজ্যের উচ্ছেদ করিয়া পনার নদ পর্য্যন্ত নিজ অধিকার প্রসারিত করিয়া লইয়াছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষে আমেদনগর রাজ্যে হুলস্থূল চলিতেছিল। চারিদল লোক স্ব স্ব প্রভুত্ব স্থাপন করিতে প্রসায় পাইতেছিল। কিন্তু পরিশেষে বীর্য্যশালিনী চাঁদবিবী তাঁহার একটী অপোগণ্ড ভ্রাতৃষ্পুত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, আমেদনগরে নিজ কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মোগলেরা উপরি উল্লিখিত চারিদলের মধ্যে এক দলের অধিপতি কর্ত্তৃক আহূত হইয়া আমেদনগর অবরোধ করিল। রাজকুমার মোরাদ এই যুদ্ধের সেনাপতি। চাঁদবিবী ঐ সাধারণ শত্রুর প্রতিরোধার্থ সমুদয় ঘরাও বিবাদ মিটাইয়া ফেলিলেন। তখন সকলে সমবেত হইয়া আত্মরক্ষার্থ উদ্যুক্ত হইল। মোরাদ দুর্গ গ্রহণ করিবার কোন উপায় না দেখিয়া চাঁদবিবীর সহিত সন্ধি বন্ধন করিলেন, কিন্তু তাঁহার সৈন্য তথা হইতে অপসারিত না হইতেই, উক্ত নগরে আবার ভয়ানক গোলযোগ আরম্ভ হইল। এবার সম্রাট নিজে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। ইতিপূর্ব্বেই বিদর প্রদেশ ও দৌলতাবাদ নগর গৃহীত হইয়াছিল। অধুনা আকবর সাহ রাজকুমার ডানিয়াল ও খানিখানাকে আমেদনগরের অবরোধার্থ পাঠাইয়া দিলেন। চাঁদবিবী তদ্দর্শনে মোগলদিগের সহিত সন্ধি করিবার জন্য চুক্তি করিতে লাগিলেন। এমন সময় একদল সৈনিক তাঁহার শত্রুগণ কর্ত্তৃক প্রোৎসাহিত হইয়া সেই শৌর্য্যশালিনী রাজ্ঞীকে নিধন করিয়া ফেলিল। এই দারুণ দুষ্ক্রিয়ার ফল হাতেহাতেই ফলিল। অবিলম্বেই মোগল সৈন্য আমেদনগর অধিকার পূর্ব্বক ভয়ঙ্কর রূপে নগরবাসীদিগকে হত্যা করিতে লাগিল

(১৬০০ খৃঃ অব্দ)। এইরূপে রাজধানী শত্রুর হস্তগত হইল কিন্তু সেই রাজ্য ইহার পর আরও ৩৭ বৎসর স্বাধীন থাকিয়া পরিশেষে সাজিহান কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। উক্ত ঘটনার পর বৎসর খান্দেশ রাজ্যটী সম্রাটের হস্তগত হইল। তখন তিনি ডানিয়ালকে বিরার ও খান্দেশের গবর্ণর নিযুক্ত করিয়া এবং প্রধান মন্ত্রী আবুল ফজেলকে আমেদনগর রাজ্য জয় করিবার নিমিত্ত আদেশ দিয়া দ্রুতপদে আগ্রার দিকে প্রত্যাগমন করিলেন। যুবরাজ সেলিমের বিদ্রোহই তাঁহার তত তাড়াতাড়ি আসিবার কারণ। সেলিম স্বভাবতঃ দুর্বুদ্ধি ছিলেন না, কিন্তু অতিরিক্ত মদ্যপান ও আফিঙ ভক্ষণে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছিল, যে পিতাকে সমুদয় সৈন্য সমভিব্যহারে দাক্ষিণাত্যে ব্যাপৃত দেখিয়া, স্বয়ং সিংহাসনে অধিরোহণ করিবার জন্য আগ্রায় উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তথাকার গবর্ণরের প্রতিবন্ধকতা নিবন্ধন কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, এলাহাবাদে প্রস্থান করিলেন, এবং অযোধ্যা ও বিহার প্রদেশ অধিকার করিয়া লইলেন।

এই সংবাদ পাইয়া আকবর নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং পুত্রকে সৎপথে প্রত্যানয়ন করিবার জন্য একপত্র লিখিলেন। তখন সেলিমের চৈতন্যোদয় হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, যে বলপূর্ব্বক সিংহাসন অধিকার করা অসম্ভব। পরন্তু পিতা ক্রুদ্ধ হইলে, রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইবার আশা ভরসা এককালে ফুরাইয়া যাইবেক। এই সময়ে যুবরাজ এক ঘোরতর দুষ্কর্ম্ম সম্পাদন করেন। তিনি আকবরের প্রধান মন্ত্রী

আবুল ফজেলের প্রতি বরাবর চটা ছিলেন, এবং তাঁহাকে আপনার পরম শত্রু বলিয়া জানিতেন। সম্প্রতি মন্ত্রিবর কতিপয় অনুচর মাত্র সমভিব্যাহারে লইয়া দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাগমন করিতেছেন দেখিয়া, দুরাত্মা সেলিম অন্যের হস্ত দ্বারা তাঁহাকে গোপনে সংহার করিয়া ফেলিল। আকবর এই সম্বাদে দুই দিন দুই রাত্রি আহার নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক অশ্রুজলে ভাসমান হইলেন। কিন্তু জানিতেন না, যে তাঁহারই পুত্র হইতে এই ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম সম্পাদিত হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সম্রাটের দ্বিতীয় পুত্র মোরাদ প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ডানিয়াল অতিরিক্ত মদ্যপানে রুগ্ন হইয়া অকালে কালকবলে পতিত হইলেন। এই সম্বাদ পাইয়া তাঁহার স্নেহার্দ্র অন্তঃকরণ শোকে নিতান্ত বিহ্বলিত হইল। তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। ক্রমে পীড়ার প্রকোপ এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, তাঁহার আরোগ্য লাভ দুঃসাধ্য বোধ হইল ; তখন রাজ্যের উত্তরাধিকার লইয়া রাজসংসারে নানা ষড়যন্ত্র হইতে লাগিল। সেলিম রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী ; এবং সম্রাটও উহা বারম্বার নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু পিতার বিপক্ষে বিদ্রোহ উত্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া, তৎকালে তিনি এক প্রকার অপদস্থ ও অবমানিত ভাবে কালযাপন করিতেছিলেন। এদিগে যুবরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র খসরুর পক্ষ বিলক্ষণ ক্ষমতাপন্ন ছিল। মানসিংহ তাঁহার মাতুল ও সম্রাটের প্রধান সেনাপতি আজিজ তাঁহার স্বশুর ছিলেন। ইহাঁরা সকলে, যাহাতে খসরু

সিংহাসনে আরোহণ করেন. তদ্বিষয়ে যোগাযোগ করিতে ছিলেন।

আকবরসাহ গোপনে এই সমস্ত বিষয় জানিতে পারিয়া স্পষ্টাভিধানে বলিতে লাগিলেন, যে সেলিমই তাঁহার রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইবেন, খসরুকে কেবল বাঙ্গালা প্রদেশ প্রদান করা যাইবেক। এইরূপে সম্রাট স্বীয় অভি-প্রায় ব্যক্ত করিলে পর, অনেকানেক ওমরা যুবরাজের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। অবশেষে আজিজ ও মানসিংহ খসরুকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার অনুকূলবর্ত্তী হইতে চাহিলেন। অনন্তর মহামনা আকবর সাহ অন্তিমকাল উপস্থিত জানিয়া আপনার নিকটে সমুদয় ওমরাদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহা-দিগকে নানা উপদেশ প্রদান করিলেন। পরে প্রত্যেকের প্রতি সতৃষ্ণভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক বলিলেন, "যদি আমি কখন আপনাদের কোন অনিষ্ট করিয়া থাকি, আমার সেই অপরাধ মার্জ্জনা করুন।" এই কথা শুনিবামাত্র সেলিম পিতার পদতলে পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন; কিন্তু আক-বর ভালমন্দ কিছু না বলিয়া আপনার সাধের তরবারির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন, এবং সকলের সমক্ষে উহা কটিতটে ধারণ করিবার জন্য যুবরাজকে সঙ্কেত করিতে লাগিলেন। তৎপরে কিছুকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া শ্রান্তি পরি-হার পূর্ব্বক সেলিমকে গম্ভীরভাবে বলিলেন, "পুত্র! যাহাতে আমার অন্তঃপুরিকাগণ,বন্ধুবর্গ ও অনুচর সকল সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারে,তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা যত্নবান থাকিবে।" এই বলিয়া মহাত্মা আকবর একজন মল্লার সহিত মুসলমান

ধর্ম্ম অনুসারে উপাসনা করিতে করিতে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। (১৬০৫)

আকবরের শরীর যেমন বলসম্পন্ন, চেহারা তেমনি সুশ্রী ছিল। তিনি অত্যন্ত সদালাপী ছিলেন, এবং তাঁহার কথায় ও ভদ্রতায় সকলেই মোহিত হইত। তিনি একবারে নেসাবর্জ্জিত ও মিতাহারী ছিলেন। অধিক কাল নিদ্রা যাইতে ভাল বাসিতেন না, দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্রের তর্কবিতর্কেই ত্রিযামার অধিকাংশ অতিবাহিত করিতেন। তিনি ব্যায়াম ও মৃগয়ায় অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন এবং ব্যাঘ্র, হস্তি প্রভৃতি বলিষ্ঠ বন্য জন্তুর যুদ্ধ দেখিয়া সাতিশয় প্রীতিলাভ করিতেন। তিনি প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করিবার জন্য দেশ বেড়াইতে বড়ই ভাল বাসিতেন। কেবল আমোদের নিমিত্ত দিন বিশ ত্রিশ মাইল পথ পাঁওদলে চলিয়া যাইতেন; অধিক কি, একদা অশ্বপৃষ্ঠে দুইদিনে আজমীঢ় হইতে আগ্রায় আসিয়াছিলেন।* আকবর পরিবার ও বন্ধুগণের প্রতি যৎপরোনাস্তি স্নেহ করিতেন এবং স্বভাবতঃ সাতিশয় সদয় ও ক্ষমাশালী ছিলেন। একদা সেলিম একজন লোককে বীতচর্ম্ম করিয়া নিধন করিয়াছেন শুনিয়া, তিনি বলিয়া উঠিয়াছিলেন, কি আশ্চর্য্য! যে ব্যক্তি একটা মৃত পশুর চামড়া তুলিয়া লওয়া স্বচক্ষে দেখিতে পারে না, তাহার পুত্র কিরূপে ঈদৃশ নিষ্ঠুরের কর্ম্ম করিল! আকবর অত্যন্ত পরিশ্রমী, কার্য্যতৎপর, সুশৃঙ্খল ও মেধাবী ছিলেন। যদিও তিনি নানাবিধ

* আজমীঢ় হইতে আগরা ১১০ ক্রোশ পথ হইবে।

ঘোরতর সংগ্রামে বিব্রত হন, ও রাজ্যের হিতার্থ মহৎ মহৎ ব্যাপার সম্পাদন করেন, তথাপি বিদ্যা ও ধর্ম্মচর্চ্চার নিমিত্ত অনেক অবকাশ পাইতেন। তাঁহার রাজসভা নানারত্নে বিভূষিত ছিল। সম্রাটের নিজের উৎসাহে ও তাঁহার মন্ত্রী পণ্ডিতবর ফাইজির দৃষ্টান্তে তাঁহার সভাসদ্গণ সর্ব্বদা সদালাপ ও সৎচর্চ্চায় কালযাপন করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে নানা গ্রন্থ সঙ্কলন পূর্ব্বক আপনাদের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। ফাইজির অনুজ ও তাঁহার প্রধান মন্ত্রী আবুল ফাজেল আইন আকবরী নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের প্রণেতা। সুবিখ্যাত বৈরাম খাঁর পুত্র মির্জা খাঁ বাবরের জীবনচরিত তুরস্ক হইতে পারস্য ভাষায় অনুবাদ করেন। গায়কচূড়ামণি তানসেন সঙ্গীতশাস্ত্রের ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করেন। ফাইজি নিজে পারস্য ভাষায় কয়েক খান পদ্য লেখেন, সংস্কৃত হইতে রাজতরঙ্গিণী * এবং ভাস্করাচার্য্যের বীজগণিত ও লীলাবতী তর্জ্জমা করেন। তাঁহারই প্রযত্নে রামায়ণ মহাভারত, বেদের কিয়দংশ ও অনেকানেক সাহিত্য অনুবাদিত হয়।

আকবরসাহ্ একেশ্বরবাদী ও অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার এই মত ছিল যে, শাস্ত্র সকল মনুষ্যকৃত, অপৌরুষেয় † নয়; কিন্তু মনুষ্যমাত্রেরই ভ্রম প্রমাদ সম্ভব, অতএব

* রাজতরঙ্গিণী কাশ্মীর দেশের প্রাচীন ইতিহাস, ইহা ভিন্ন সংস্কৃত ভাষাতে লিখিত আর প্রকৃত ইতিহাস গ্রন্থ বিদ্যমান নাই।

† অপৌরুষেয় স্বতঃসিদ্ধ বা ঈশ্বর প্রণীত। মাধবাচার্য্য বেদের অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য বিস্তর আড়ম্বর করিয়াছেন।

কোন শাস্ত্রই অভ্রান্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। যুক্তিই সমুদায় তত্ত্ব জানিবার একমাত্র উপায়; যুক্তিবিরুদ্ধ কোন কথাই গ্রাহ্য হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়দমন, ঈশ্বরোপাসনা ও পরোপকার এই তিনটী প্রধান ধর্ম্ম; কেবল এই সকল সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানেই পরকালের শ্রেয়োলাভ হয়। তবে মনুষ্যের ধর্ম্মবুদ্ধি সাধারণতঃ তত প্রখর ও বিশুদ্ধ নয়। তন্নিমিত্ত ধ্যান, পূজা, ভিক্ষাদান, তীর্থযাত্রা; উপবাস প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ লোকের প্রবৃত্তি অনুসারে আবশ্যক বোধ হয়। যাহাহউক, আকবরের এই অভিনব ধর্ম্ম কেবল তাঁহার বন্ধুবর্গ ও সভাসদ্গণের মধ্যেই আদৃত হইয়াছিল; সাধারণলোক উহার মর্ম্ম বুঝিতে পারে নাই। গোঁড়ামুসলমানেরা, বিশেষতঃ মোল্লারা আকবরের এই ধর্ম্মকে কোরাণবিরুদ্ধ বলিয়া বড়ই চটিয়া উঠিত এবং তাহাকে নাস্তিক ও বিধর্ম্মী বলিয়া নিন্দা করিত।

আকবর একবারে কুসংস্কারবর্জ্জিত ছিলেন; কোনধর্ম্মে অণুমাত্র দ্বেষ প্রকাশ করিতেন না, প্রত্যুত মুসলমান, হিন্দু খৃষ্টান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিতেরা কিরূপে স্বমত সমর্থন ও পরমত খণ্ডন করেন, উহা শুনিতে সাতিশয় ভাল বাসিতেন। মুসলমান রাজারা বরাবর হিন্দুদিগের নিকট হইতে জিজিয়ানামে* এক প্রকার কর আদায় করিতেন। উহা অত্যন্ত ঘৃণাজনক ও কষ্টকর ছিল। গোঁড়া যবনেরা বলিত হিন্দুরা বিধর্ম্মী; উহাদের প্রাণদণ্ড করা উচিত, কিম্বা তৎ-

* জিজিয়া টেক্স হিন্দুদের মাথা গণতি করিয়া আদায় হইত। আরঙ্গজীবের সময়ে খৃষ্টীয়ানদিগকেও এই কর দিতে হইয়াছিল।

পরিবর্ত্তে এরূপ এক বিশেষ করগ্রহণ করা যাইতে পারে, যে তাহা মৃত্যু যন্ত্রণার তুল্য অসহ্য হয়। মহামনা আকবর তাঁহার রাজত্বের সপ্তম অব্দে জিজিয়া রদ করিয়া দেন, এবং হিন্দুতীর্থ-যাত্রীদের উপর যে এক প্রকার কর আদায় হইত, তাহাও রহিত করেন। ইহার পর দুইশত বৎসরেরও অধিক কাল অতীত হইলে, ইংরাজেরা আবার এই শেষোক্ত করের উদ্ভাবন করেন এবং অকুণ্ঠিতচিত্তে লর্ড আকলাণ্ডের আমল পর্য্যন্ত তৎসংগ্রহে যত্নশীল হন। যাহাহউক, সম্রাট হিন্দুদের কয়েকটী অহিতকর প্রথা রহিত করিয়া দিতে বিলক্ষণ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অগ্নিপরীক্ষা * বাল্যবিবাহ ও জোর করিয়া সহমরণ যাহাতে না হয়, তজ্জন্য উৎসুক ছিলেন, এবং বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলিত করিতেও বিলক্ষণ উৎসাহ প্রদর্শন করেন।

আকবরসাহ রাজনীতি শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তিনি এমনি পক্ষপাতশূন্য যে, যাহাতে হিন্দু ও মুসলমান এই প্রভেদ এককালে তিরোহিত হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করে, ইহা তাঁহার আন্তরিক বাসনা ছিল। তিনি এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিবার নিমিত্ত কায়মনোবাক্যে যত্ন করিতেন। তাঁহার আমলে রাজসভা ও রাজসংসারে মহা জাকজমক ছিল; কিন্তু সকল বিষয়ে সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলা দৃষ্ট হইত। সেই সকল সমৃদ্ধি ও

* সতীত্ব বা সত্য পরীক্ষার জন্য কড়াতে তেল ফুটাইয়া একটি আঙটি ছাড়িয়া দেওয়া হইত। যাহার পরীক্ষা হইবে, তাহাকে উহা তুলিয়া লইতে হইত। যদি সে অক্ষত থাকিত, তবেই তাহার সতীত্ব বা সত্যবাদিতা সাব্যস্ত হইত, নতুবা হইত না।

ঐশ্বর্য্যের মধ্যে মহামনা আকবর কোন প্রকার আড়ম্বর বা অভিমান প্রকাশ না করিয়া অত্যন্ত নম্রভাবে অথচ গৌরবের সহিত অবস্থান করিতেন। তিনি এমনি অমায়িক ও অহমিকাহীন ছিলেন, যে একজন ছোটলোকের সঙ্গেও হাসিয়া কথা কহিতেন, এবং একজন সামান্যলোকের নিকট হইতে যৎকিঞ্চিৎ উপহার পাইয়া যেরূপ আমোদ করিতেন, কোন ওমরার মহামূল্য উপঢৌকনেও তত প্রীতি প্রকাশ করিতেন না। তিনি শিল্পবিদ্যায় বিলক্ষণ নিপুণ ছিলেন এবং কামান ও যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র স্বহস্তে প্রস্তুত করিতে পারিতেন। যুদ্ধবিদ্যায় আকবরের অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। তাঁহার সাহস, বিক্রম ও কৌশল অতি উচ্চ শ্রেণির ছিল। তিনি মহাবীর নেপোলিয়নের ন্যায় সকল কার্য্যে এরূপ ক্ষিপ্রকারিতা প্রদর্শন করিতেন এবং অসাধ্য সাধনে ও অতর্কিত আক্রমণে ঈদৃশ পৌরুষ প্রকাশ করিতেন, যে তাঁহার শত্রুগণ সহজেই পর্য্যুদস্ত হইয়া পড়িত। তথাপি তিনি উক্ত ফরাসি সম্রাটের মত সমরকার্য্যে অনুরাগী ছিলেন না; রিপুকে একবার নির্বীর্য্য করিতে পারিলেই, সেনাপতিদের হস্তে দেশজয় ও শৃঙ্খলাস্থাপনের ভার দিয়া দ্রুতপদে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিতেন, এবং রাজ্যশাসন ও জ্ঞানচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিতেন, অথবা মৃগয়া, ব্যায়াম, দেশপর্য্যটন প্রভৃতি আমোদকর কার্য্যে রত হইতেন। তিনি সৈন্যের মধ্যে অনেক সুনিয়ম প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার পূর্ব্বে সেনাপতিগণ নিষ্কর জায়গির বা কোন জনপদের রাজস্ব আদায় করিয়া লইবার ক্ষমতা পাইয়া এক এক দল ফৌজ রাখিতেন এবং যুদ্ধকালে তাহা

দিগকে লইয়া সম্রাটের সাহায্য করিতেন। কিন্তু এই প্রথা নানাদোষসঙ্কুল ছিল। জায়গিরদার ও রাজস্বভোগী সেনানীগণ উভয়েই নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ফৌজ রাখিতেন না; যুদ্ধকালে প্রতারণা পূর্ব্বক নিজ নিজ চাকর বাকর ও উমিলোক সমভিব্যাহারে লইয়া দল পূরণ করিয়া দিতেন। পরন্তু শেষোক্ত সেনাপতিগণ অসহায় প্রজাদের উপর নানা অত্যাচার করিয়া রাজস্ব আদায় করিবার ছলে তাহাদের সর্ব্বস্ব শোষণ করিতেন। বিচক্ষণ আকবর সাহ উক্ত অহিত প্রথা রহিত করিয়া এই নিয়ম করিলেন যে, সৈনিকগণের বেতন রাজস্বের উপর বরাত না দিয়া, রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হইবেক, এবং সৈন্যসংগ্রহকালীন প্রত্যেক সৈনিকের আকার প্রকার ও চেহারা স্পষ্টরূপে তালিকাতে নির্দ্দেশ করিতে হইবেক, নতুবা বেতন বাহির হইবেক না। আরও, তৎকালে জায়গিরদারদিগের দমনের নিমিত্ত অনেক সুনিয়ম প্রচারিত হইয়াছিল। আকবর সাহের সময়ে সাম্রাজ্য পনের সুবাতে * বিভক্ত হয়। প্রত্যেক সুবাতে এক এক জন সুবাদার ও তাঁহার অধীনে কয়েক জন করিয়া কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিলেন। মহারাজ আকবর সাহ যতপ্রকার মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তন্মধ্যে তাঁহার রাজস্বপ্রণালী সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। যদি তিনি আর কোনও হিতকর ব্যাপার

* পনের সুবা এই—এলাহাবাদ, আগ্রা, অযোধ্যা, আজমীঢ়, গুজরাট, বিহার, বাঙ্গালা, দিল্লী, কাবুল, লাহোর, মুলতান ও মালব এই বারটী হিন্দুস্থানে, এবং বিরার, খান্দেশ ও আহমদনগর এই তিনটি দাক্ষিণাত্যে। আরঙ্গজীবের সময়ে দাক্ষিণাত্যে আর তিনটি নূতন সুবা বাড়ে। যথা বিদর্ভ, হাইদরাবাদ ও বিজয়পুর।

সম্পাদন করিয়া যাইতে না পারিতেন, তথাপি কেবল এই একটী কার্য্য দ্বারা তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিত। সম্রাটের একজন প্রধান মন্ত্রী ও সেনাপতি রাজা তোদরমল্লের প্রযত্নে ও কার্য্যদক্ষতাগুণে এই সুপ্রসিদ্ধ রাজস্বপদ্ধতি সুসমাহিত হয়। প্রথমতঃ জমির জরিপ হইতে লাগিল, তৎপরে উর্ব্বরতা অনুসারে সমুদয় ভূমি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইল। পরিশেষে, প্রত্যেক প্রকারের জমিতে প্রতি বিঘায় গড়ে কত উৎপন্ন হয়, এবং উহার মূল্যই বা কত, তাহা নির্দ্ধারিত হইল। তখন সম্রাট সমুদায় আয়ের তিন ভাগের একভাগ রাজকর বলিয়া ধার্য্য করিলেন। কিন্তু ভূমিসংক্রান্ত আর যে সব কর ও বাবসবাব ছিল, তাহা রহিত করিয়া দিলেন। এই বন্দোবস্ত নিবন্ধন প্রজাবর্গের ভারের অনেক লাঘব হইল, কিন্তু চুরি ও তহবিল-ভাঙ্গার বড় সুবিধা না থাকাতে ভূমি হইতে পূর্ব্বে রাজসংসারে যে আয় হইত, উহার পরিমাণ বড় কমিল না। যাহাতে এই বন্দোবস্ত দ্বারা প্রজালোকের সুখস্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধিত হয়, তদ্বিষয়ে সম্রাট যৎপরোনাস্তি উৎসুক ছিলেন। যাহাতে রাজস্বের ইজেরা দেওয়া না হয় এবং কালেক্টরেরা গ্রামের মণ্ডল বা পাটোয়ারির কথায় না ভুলিয়া, সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রত্যেক রাইয়তের সহিত তাবৎ বিষয়ের নিষ্পত্তি করেন, তন্নিমিত্ত তিনি অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। অতএব ইহা সাহস পূর্ব্বক বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার এই বন্দোবস্ত নিবন্ধন অনেকাংশে প্রজাপুঞ্জের সুখ-স্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

আকবর সাহের চরিত্র অতি পবিত্র ও মনোরম। উহা

সমালোচন করিলে, মনে বিশুদ্ধ ভক্তিরসের উদয় ও অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার হয়। তাঁহার ইতিবৃত্ত ভূপতিদিগের আদর্শ স্বরূপ। কেবল মনুষ্যজাতির মঙ্গলসাধনার্থই তিনি ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে কখন তত্তুল্য সর্ব্বগুণসম্পন্ন ভূপতি অবতীর্ণ হইয়াছে কি না সন্দেহ।

জাহাঙ্গির। ১৬০৫—১৬২৭।

সেলিম সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া, জাহাঙ্গির অর্থাৎ ভুবনবিজয়ী এই উপাধি ধারণ করিলেন। তিনি স্বভাবতঃ বিচক্ষণ ও দয়াশীল ছিলেন না। কিন্তু রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রথমতঃ যে কয়েকটী সুনিয়ম প্রচারিত করিয়া দিলেন তাহাতে তাঁহার বিলক্ষণ বিজ্ঞতা ও প্রজানুরাগ প্রকাশ পাইতেছে। যদিও নিজে মাতালের শিরোমণি, তথাপি এই হুকুম জারি করিলেন যে, কোন ব্যক্তি মদ্যপান করিতে পারিবেক না, এবং অনিয়মিতরূপে অহিফেণ সেবন করিলে দণ্ডার্হ হইবেক। যাহাতে প্রজাগণ সহজে তাঁহার কাছে নিজের দুঃখ জানাইতে পারে, তজ্জন্য সম্রাটের স্বকীয় কামরাতে কয়েকটা ঘণ্টা টাঙ্গাইয়া একগাছ রজ্জুতে লাগান হইল। ঐ রজ্জুর অগ্রভাগ বাহিরের প্রাচীরে ঝোলান ছিল। যে কোন অর্থী উহা ধরিয়া টানিলেই অভ্যন্তরস্থিত ঘণ্টিকা সকল রণরণ ধ্বনি করিয়া সম্রা-

টের গোচর করিত, সুতরাং সম্রাটের সাক্ষাৎকার লাভার্থ ক্ষুদ্র আমলাগণের খোষামোদ করিতে হইত না। জাহাঙ্গির এই অভিনব উপায় উদ্ভাবন করাতে আপনার পক্ষে একটী বিশেষ শ্লাঘার কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন।

জাহাঙ্গির ও তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের মধ্যে পরস্পর এত অকৌশল, যে উহা সহজে মিটিবার নহে। ১৬০৬ অব্দের প্রারম্ভে একদিন নিশীথ সময়ে খসরু কতিপয় অনুচর সমভি-ব্যাহারে লইয়া লাহোরের দিকে পলায়ন করিলেন। তথায় দশ হাজার লোক তাঁহার পতাকার অধীনে আসিয়া জুটিল। কিন্তু অবিলম্বেই সম্রাটের একদল ফৌজ উপস্থিত হইয়া, তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া ফেলিল। জাহাঙ্গির বিদ্রোহীদের ভয়ঙ্কর দণ্ড বিধান পূর্ব্বক পুত্রকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। খসরু তদবধি মনের দেখে নিতান্ত দীনভাবে কালহরণ করিতে লাগি-লেন।

নূতন সম্রাট নিজ রাজত্বের ষষ্ঠবর্ষে নুরজিহানের পাণিগ্রহণ করেন। এইটী তাঁহার আমলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ঘটনা। এই রমণীর পিতামহ তিহরাণের অধিবাসী একজন সম্ভ্রান্ত রাজ-পুরুষ ছিলেন। কিন্তু ইহাঁর পিতা মির্জা গিয়াস এরূপ দুরবস্থায় পতিত হন,* যে চাকরীর প্রত্যাশায় স্বদেশ ছাড়িয়া প্রস্থান করেন। পথিমধ্যে তাঁহার পত্নী একটী কন্যা প্রসব করিলেন, কিন্তু তৎকালে তাঁহাদের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছিল। অতএব নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, পথের ধারেই সেই সদ্যোজাত মেয়ে-টীকে পরিত্যাপূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। তাহারা যে বণিক সম্প্র-

দায়ের সমভিব্যাহারে আসিতেছিলেন, তাহাদের মধ্যে একজন প্রধান সওদাগর ঐ কন্যাটিকে দেখিতে পাইলেন। উহার তাদৃশ দুর্দ্দশাও আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া তাঁহার মনে দয়া জন্মিল। তিনি তৎক্ষণাৎ উহাকে তুলিয়া লইলেন, কিন্তু একজন ধাই ব্যতীত কে লালনপালন করে এই ভাবিতেছেন, এমন সময়ে গিয়াসের ভার্য্যাকে দেখিতে পাইয়া, তাঁহাকেই অজ্ঞাত-সারে ধাত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। যাহাহউক, সেই সও-দাগর পরে সমস্ত অবগত হইয়া গিয়াসের প্রতি সাতিশয় অনু-গ্রহ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে অবস্থার অপেক্ষা উচ্চ-দরের লোক জানিয়া সম্রাট আকবরের নিকট একটী চাকরির জন্য সুপারিষ করিলেন। গিয়াস ও তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র আসফ রাজসরকারে নিযুক্ত হইয়া, নিজ কার্য্যদক্ষতাগুণে ক্রমশঃ উচ্চ উচ্চ পদে অধিরোহণ করিতে লাগিলেন। দিন দিন নুরজিহান ইন্দুকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। তাঁহার লাবণ্য ও মধুরভাব যে একবার অবলোকন করে, সেই চমৎকৃত হয়। তিনি জননীর সমভিব্যাহারে রাজবাটীতে গমনাগমন করিতেন। যুবরাজ সেলিম তাঁহাকে নেত্রপথের অতিথি করিয়া নিতান্ত মোহিত হইলেন। আকবরসাহ সেই সম্বাদ পাইয়া ভাবী অন-র্থের পরিহারার্থ সিয়ার খাঁ নামক একজন পারস্যদেশীয় আফ-গানের সহিত নুরজিহানের পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া,তাঁহাকে বর্দ্ধমানের গবর্ণরী পদে নিযুক্ত করিলেন। সিয়ার সস্ত্রীক বর্দ্ধমানে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেলিম পিতার বিরাগভয়ে নুরজিহানের প্রতি নিজের অনুরাগ গোপন করিয়া

রাখিয়াছিলেন, কিন্তু সিংহাসনে অধিরোহণ করিবার পরেই নিজ দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত ধাত্রীর পুত্র কুতবুদ্দিনকে বাঙ্গালার গবর্ণরী পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। কুতব মনে করিয়াছিলেন, কেবল প্রলোভন বা ভয় প্রদর্শনেই কার্য্যসিদ্ধ হইবেক। সিয়ার সে ধাতুর লোক ছিলেন না। তিনি ধন ও প্রাণ অপেক্ষা মানকে বড় বলিয়া জানিতেন। অতএব নূতন সম্রাটের কুমতলবের আভাস পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ স্বীয় পদ পরিত্যাগ করিলেন। তখন কুতবুদ্দিন তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহার নিকট জাহাঙ্গিরের অভিপ্রায় ব্যক্ত কবিলেন। সিয়ার যেমন মনস্বী তেমনি বীর্য্যসম্পন্ন ছিলেন। তিনি এই অবমাননাকর প্রস্তাবে ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া সেই মুহুর্ত্তেই ছুরিকার আঘাতে কুতবকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহাব অনুচরবর্গের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তিকে হত আহত করিয়া অবশেষে বিপক্ষগণের প্রহারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া ধরাশায়ী হইলেন।

অনন্তর জাহাঙ্গিব নুরজিহানকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন কিন্তু তিনি সেই পতিহন্তাব প্রতি এরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, যে সম্রাট নিতান্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে মাতার অনুচরীর পদে নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন। যাহাহউক কিছুদিনেব পরেই তাঁহার পুরাতন অনুরাগ আবার উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। নুরজিহানও তাদৃশ প্রলোভকর অভ্যর্থনায় আর অসম্মতি প্রকাশ করিতে পারিলেন না। অতএব অবিলম্বেই মহাসমৃদ্ধিসহকারে তাঁহাদের পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইল।

নুরজিহানের এমনি একটী মোহিনী শক্তি ছিল যে, জাহাঙ্গির অচিরে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার বশতাপন্ন হইলেন। তিনি সাতিশয় প্রজ্ঞাশালিনীও ছিলেন। অবলীলাক্রমে রাজ্যতন্ত্র-সংক্রান্ত দুর্গম ব্যাপার সকল বুঝিতে ও সমাধা করিতে পারিতেন। সম্রাট তাঁহার অমতে কোন কার্য্যই করিতেন না। নুরজিহানের পিতা অধুনা প্রধানমন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত হইলেন। তিনি একজন বিজ্ঞ ও ন্যায়বান লোক ছিলেন। নুরজিহান তাঁহার পরামার্শ না লইয়া কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন না সুতরাং অধুনা রাজ্যতন্ত্রের সমুদয় ব্যাপার পূর্ব্বাপেক্ষা সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে লাগিল। জাহাঙ্গির স্বভাবতঃ অব্যবস্থিতচিত্ত ও স্বেচ্ছাচারী; কিন্তু এখন মহিষীর শাসনবশতঃ পূর্ব্বের ন্যায় নিষ্ঠুর কার্য্য করিতে বা প্রকাশ্যরূপে মাতলামি করিতে পারিতেন না। নুরজিহান জাঁকজমক বড়ই ভাল বাসিতেন; তাঁহার আধিপত্য কালে রাজসভার সমৃদ্ধি অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি তিনি এরূপ সুবিবেচনার সহিত কার্য্য করিতেন যে তাঁহার বন্দোবস্ত নিবন্ধন অনেকাংশে রাজসংসারে ব্যয়ের লাঘব হইয়াছিল।*

উদয়পুরের রাণার সহিত প্রথমাবধি সংগ্রাম চলিতেছিল। প্রসিদ্ধ সেনাপতি মহাবৎ খাঁ তাঁহার প্রতিকূলে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি বিপক্ষকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারেন নাই। এই

* কথিত আছে, তাহা হইতেই আতরের সৃষ্টি হয়

প্রদেশের ভূমি অত্যন্ত অনুর্ব্বর ও জলবায়ু যৎপরোনাস্তি অস্বাস্থ্যকর। উদয়পুরের অন্তর্গত এরূপ অনেক অরণ্যময় উপত্যকা আছে; যে তন্মধ্যে গিয়া পথ নিরূপণ করা নিতান্ত দুরূহ। উদয়পুরের রাণা বড় পীড়াপীড়ি দেখিলে সেই সকল কান্তারে প্রবেশ পূর্ব্বক নিরাপদে অবস্থান করিতেন। মোগল সৈন্য উহা ভেদপূর্ব্বক আক্রমণ করিতে সমর্থ হইত না। কিন্তু অধুনা সম্রাটের প্রিয়পুত্র সাহজিহান বিশহাজার ফৌজ লইয়া উদয়পুরে অভিযান করিলেন, এবং বিপক্ষের দমনার্থ এরূপ বিক্রম, কৌশল ও অধ্যবসায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন, যে অবশেষে উদয়পুরের অধিপতি বশীভূত হইতে চাহিলেন। বিচক্ষণ রাজকুমার পিতামহের দৃষ্টান্ত অনুসারে বিজিত শত্রুর প্রতি সাতিশয় সৌজন্য প্রকাশ করিলেন। যেমন রাণা অভিবাদন করিবেন; অমনি হস্তধারণ পূর্ব্বক, তাঁহাকে পার্শ্বদেশে উপবেশন করাইয়া যথোচিত সমাদর করিলেন, এবং আকবর সাহের সময় হইতে যে কয়েকটি জনপদ জয় করা হইয়াছিল, তৎসমস্ত ফিরিয়া দিলেন। এই জয়লাভে সাহজিহানের যৎপরোনাস্তি প্রতিপত্তি হইল। তিনি ইতিপূর্ব্বে নুরজিহানের ভ্রাতা আসফ খাঁর কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তৎপ্রযুক্ত রাজমহিষী তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুকূল ছিলেন। সুতরাং সকলে মনে করিতে লাগিল, সম্রাটের পর সাহজিহানই রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইবেন।

অনন্তর, সাহজিহান দাক্ষিণাত্যের গোলমাল সকল নিরাকরণ করিতে নিযুক্ত হইলেন। আকবরের সময়ে আমে-

নগরের কিয়দংশ মোগলসৈন্যের দ্বারা অধিকৃত হইলে পর, উক্ত রাজ্যের শাসনকার্য্য আবিসিনিয়া দেশীয় মল্লিক অম্বরের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। মল্লিক অম্বর যেমন সমরনিপুণ, তেমনি প্রজ্ঞাশালী। তিনি বিজয়পুরের রাজার সহিত সন্ধি বন্ধন করিয়া, আরঙ্গাবাদ নগরে রাজধানী স্থাপন করেন, এবং মোগলসৈন্যকে বারম্বার পরাভূত করিয়া, তাহাদের নিকট হইতে অনেক জনপদ উদ্ধার করিয়া লন। শাসনকার্য্যে তাঁহার অসাধারণ পটুতা ছিল। তিনি রাজাতোদরমল্লের অনুকরণ পূর্ব্বক দাক্ষিণাত্যে এক নূতন প্রকার রাজস্ব প্রণালী প্রচলিত করিয়া দেন। যৎকালে সাহজিহান সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন, তখন ঘরাও বিবাদে মল্লিক অম্বরকে বিব্রত হইতে হইয়াছিল। সুতরাং বিচক্ষণ রাজকুমার বিজয়পুরের রাজাকে স্বপক্ষে আনয়ন করিতে কৃতকার্য্য হইলেন। তদ্দর্শনে উক্ত মন্ত্রিবর ১৬১৭ অব্দের শেষে সম্রাটের বশীভূত হইলেন। কিন্তু এই ঘটনার চারিবৎসর পরে আবার দিল্লীশ্বরের সহিত বিবাদ বাঁধিল। জাহাঙ্গির সেই সম্বাদ পাইয়া সাহজিহানের প্রতি সতৃষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন, " যদি খসরুকে আমার হস্তে সমর্পণ করা হয়, তবে দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধযাত্রা করিতে সম্মত আছি " নতুবা যাইব না। সম্রাট তাহাতেই রাজি হইলেন। অনন্তর যুবরাজ রণক্ষেত্রে অবতরণ পূর্ব্বক শত্রুকে পরাজয় করিলেন; কিন্তু নিরন্তর সংগ্রামের দাপটে তৎপ্রদেশের ঈদৃশ ভয়ানক দুরবস্থা ঘটিয়াছিল যে, তথায় যুদ্ধ চালান

দুষ্কর, অতএব উভয় পক্ষই নিবৃত্তিলাভ করিতে উৎসুক হই-য়াছিল। অতএব সহজে সন্ধি স্থাপন হইল। এমন সময়ে সম্বাদ আসিল যে, সম্রাট গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন। ইহার অব্যবহিত পরেই প্রকাশ পাইল, যে তাঁহার জ্যেষ্ঠকুমার খসরু হঠাৎ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তৎকালে লোকে পূর্ব্বাপর ঘটনা সকল অনুধাবন পূর্ব্বক সাহজিহানের উপরেই দারুণ সন্দেহ করিতেলাগিল। কিন্তু এস্থলে বিবেচনা করা উচিত যে, যে ব্যক্তি আর কখন কোন দুষ্কর্ম্ম করেন নাই, তিনি যে এরূপ ঘোরতর হত্যাকাণ্ডে কলুষিত হইবেন, ইহা বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে সহজে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না।

যাহাহউক,এই সময় থেকেই সাহজিহানের প্রতি বিধাতা বাম হইলেন। নুরজিহান রাজ্যতন্ত্রে সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। তিনি দেখিলেন, উক্ত রাজপুত্র যেরূপ প্রভুত্বপ্রিয়, বিচক্ষণ ও কার্য্যতৎপর, তাহাতে তাঁহার উপর কর্ত্তৃত্ব চালান অসাধ্য। পরন্তু সেয়ার খাঁর ঔরসজাত তাঁহার যে একটি কন্যা ছিল, উহার সহিত সম্রাটের কনিষ্ঠপুত্র সেরিয়ারের বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল; অতএব যাহাতে সেরিয়ার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তাহাই কর্ত্তব্য। নুরজিহান ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া, এই সংকল্প করিলেন যে, যাহাতে সাহজিহান স্থানান্তরিত হন, তদ্বিষয়ে চেষ্টা দেখিতে হইবে। এইরূপ মতলব আঁটিয়া তিনি বলিলেন যে, পারসীকেরা কান্দাহার অধিকার করিয়া লইয়াছে, অতএব উক্ত রাজ-কুমার উহার উদ্ধারার্থ প্রেরিত হউন। জাহাঙ্গিরের পক্ষে

রাজ্ঞীর প্রার্থনা গুরুআজ্ঞা। সুতরাং অবিচারিতচিত্তে তাঁহাকে কান্দাহারের উদ্দেশে অভিযান করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু সুচতুর সাহজিহান বিমাতার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, পাকতঃ অসম্মতি প্রকাশ করিলেন; এবং পিতার নিকট আসিয়া সমুদয় নিবেদন করিতে চাহিলেন। কিন্তু তিনি কর্কশস্বরে তিরস্কার পূর্ব্বক বলিয়া পাঠাইলেন যে, তুমি অবিলম্বে নিজের অধীনস্থ সমুদায় সৈন্যসামন্ত সেরিয়ারের হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক দাক্ষিণাত্যে প্রস্থান করিবে। কিছুকাল পিতাপুত্রের বিরোধ মেটাইবার জন্য চেষ্টা হইল, কিন্তু তাহাতে নুরজিহান কেন্দ্রী ছিলেন, সুতরাং তাঁহার কুপরামর্শে সকলই নিষ্ফল হইয়া গেল। রাজমহিষী নানা-গুণে বিভূষিতা হইলেও, স্ত্রীলোকসুলভ চপলতাশূন্য ছিলেন না। যতদিন তাঁহার পিতা বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহার সৎপরা-মর্শের গুণে, বড় একটা যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিতেন না। কিন্তু এখন তাঁহাকে একটীও কথা বলে, এমন লোক ছিল না।

এইরূপে সাহজিহান নিজের সর্ব্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া পিতার বিপক্ষে বিদ্রোহ উত্থাপন করিলেন এবং রাজ-ধানীর অদূরে সম্রাটের সৈন্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হই-লেন। কিন্তু জয় পরাজয় অনিশ্চিত রহিল। অনন্তর সাহজি-হান দাক্ষিণাত্যের দিগে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার অনুসর-ণার্থ জাহাঙ্গির, তখনকার জ্যেষ্ঠপুত্র পরবীজ ও কাবুলের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা মহাবৎখাঁকে সসৈন্যে প্রেরণ করিলেন। যাহারা প্রথমে সাহজিহানের পক্ষ ছিল, তাহারা একে একে

তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিতে লাগিল। তিনি নর্ম্মদা নদী পার হইয়া বরহানপুরে আশ্রয় লইলেন, কিন্তু মহাবৎখাঁ আসিতেছেন শুনিয়া তৈলঙ্গ দিয়া বঙ্গদেশে উপস্থিত হইলেন। বাঙ্গালা ও বিহার তাঁহার অধীনস্থ হইল। কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ শীঘ্র মহাবৎ খাঁর নিকট পরাজিত হইয়া, ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল, এবং তিনি গত্যন্তর না দেখিয়া পুনরায় দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় লইলেন। তথায় তাঁহার অবশিষ্ট অনুচরগণ তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিতে লাগিল। সাহাজিহান এখন মনের খেদে ও শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতএব ১৬২৫ অব্দে অতিবিনীতভাবে পিতাকে লিখিলেন, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন, আপনি যাহা অনুমতি করিবেন, তাহাই করিব। জাহাঙ্গির এই উত্তর দিলেন যে, "রোহতস ও আসিরারগড় নামক যে দুইটি কেল্লা অদ্যাপি তোমার হস্তগত আছে, উহা ছাড়িয়া দেও, এবং তুমি যে ভবিষ্যতে আর অনিষ্টচেষ্টা করিবে না উহার জামিনস্বরূপ তোমার দুই পুত্র দারা ও আরঙ্গজীবকে আমার নিকট পাঠাইয়া দেও। সাহজিহান তাহাই করিলেন। কিন্তু ইহার পর পিতাপুত্রে কিরূপ মিল হইত বলা যায় না; কারণ অবিলম্বেই এক অভাবনীয় ঘটনায় সমস্ত.সাম্রাজ্য টলটলায়মান হইয়া উঠিল।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মহাবৎ খাঁ সাহজিহানের বিদ্রোহ শান্তি করিয়া সকলের নিকট যৎপরোনাস্তি প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথমাবধি নুরজিহানের ভ্রাতা আসফ

খাঁর সহিত তাঁহার বৈরভাব ছিল। সম্প্রতি আবার রাজকুমার পরবীজের সঙ্গে তাঁহার বিলক্ষণ সদ্ভাব ও ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া রাজ্ঞীর মনে বিষম বিদ্বেষের উদয় হইল। অধুনা কিসে তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবেন, কেবল সেই মতলব আঁটিতে লাগিলেন। হঠাৎ মহাবতের নামে দুইটি অভিযোগ হইল যে, তিনি বঙ্গদেশের অধিকার কালে প্রজাপীড়ন করিয়াছেন এবং তহবিল ভাঙ্গিয়া সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছেন। অতএব জবাবদিহি করিবার নিমিত্ত সম্রাটের নিকটে আহূত হইলেন। তিনি প্রথমতঃ যাহাতে তথায় যাইতে না হয়, তজ্জন্য অনেক কারণ দর্শাইতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না দেখিয়া, নিজের নিতান্ত অনুগত পাঁচ হাজার রাজপুত যোদ্ধা সমভিব্যাহারে লইয়া বিতস্তার পূর্ব্বপারে উপস্থিত হইলেন এবং সম্রাটের রক্ষীগণকে সহসা আক্রমণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। এই আকস্মিক অসমসাহসিক কাণ্ড শ্রবণ করিয়া, সকলে অবাক হইয়া পড়িল। নুরজিহান বস্তুতঃ শঙ্কিত হইলেন, কিন্তু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় না হইয়া ছদ্মবেশে নদীর ওপারে পৌঁছিলেন। তথায় সম্রাটের শিবির সন্নিবেশিত ছিল। রাজ্ঞী তৎক্ষণাৎ নিজ-ভ্রাতা আসফ খাঁ ও অন্যান্য অমাত্যগণকে ডাকাইলেন এবং তাঁহাদিগকে কাপুরুষ ও অকর্ম্মণ্য বলিয়া তিরস্কার পূর্ব্বক স্বয়ং সসৈন্যে নদীপার হইতে চলিলেন। কিন্তু মহাবৎ খাঁর রাজপুত যোদ্ধারা এরূপ প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করিল, যে তাঁহার সৈনিকগণ পালে পালে নিহত হইয়া বিতস্তার

স্রোতে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। নুরজিহান আর বলপ্রকাশ করা নিষ্ফল দেখিয়া পতির সহিত বন্দীভাবে অবস্থান করিতে চলিলেন। কিন্তু তখনও প্রত্যুৎপন্নমতি তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। তিনি গোপনে স্বপক্ষীয় লোক সকল সম্রাটের চতুষ্পার্শ্বে স্থাপিত করিতে লাগিলেন, এবং ছল-পূর্ব্বক একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া লইলেন। এইরূপে আস্তে আস্তে সমস্ত বন্দোবস্ত সমাপন হইলে পর রাজ্ঞী রাজপুত রক্ষিগণের উপর সহসা চড়াও হইলেন এবং তাহা-দিগকে সংহারপূর্ব্বক পতিকে মুক্তি করিয়া আপনাদের আধিপত্য পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলেন।

মহাবৎ খাঁ অতঃপর আপত্তি করা দুঃসাধ্য দেখিয়া এবং নুরজিহানের সঙ্গে পুনর্মিলন হওয়া অসম্ভব বুঝিয়া, দাক্ষি-ণাত্যে প্রস্থান করিলেন। সাহজিহানও সত্বর তাঁহার নিকট আসিয়া জুটিলেন। ভাগ্যলক্ষ্মী পুনর্ব্বার তাঁহার অনুকূল-বর্ত্তিনী হইলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন, জ্যেষ্ঠ সহোদর পরবীজের পরলোক হইয়াছে, সম্প্রতি সংবাদ পাইলেন যে জাহাঙ্গির কাশরোগে সংশয়াপন্ন হইয়াছেন। এদিকে তাড়াতাড়ি সম্রাটকে কাশ্মীর হইতে লাহোরে আনা হইল। কিন্তু তিনি পথিমধ্যেই প্রাণত্যাগ করিলেন। জাহা-ঙ্গিরের রাজত্বকালে আমেরিকা হইতে এদেশে সর্ব্ব প্রথম তামাকের আমদানি হয়। যাহাতে লোক এই মাদক দ্রব্য ব্যবহার না করে, তন্নিমিত্ত সম্রাট অনেক হুকুমজারি করি-য়াছিলেন। কিন্তু যে বস্তু সকলের উপাদেয়, উহা কখন রাজাজ্ঞায় রহিত হইতে পারে না।

সাহজিহান। ১৬২৭—১৬৫৭।

পতির সহিত নুরজিহানের আধিপত্য অন্তর্হিত হইল এবং তাঁহার এতকালের ষড়যন্ত্র সকলি নিষ্ফল হইয়া গেল। তথাপি তিনি স্নেহভাজন সেরিয়ারের সহায়তা করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কিন্তু আসফ খাঁ অবিলম্বে ভগিনীকে রুদ্ধ করিয়া*জামাতার নিকট একজন দূত পাঠাইলেন এবং দ্রুতপদে লাহোরে প্রয়াণ পূর্ব্বক সেরিয়ারকে পরাভূত করিলেন। এই রাজপুত্র পরে সাহজিহানের হস্তে পতিত হইয়া তদীয় আজ্ঞায় নিহত হইয়াছিলেন।

সাহজিহান সিংহাসনে অধিরূঢ় হইবার পরেই আসফ খাঁ ও মহাবৎ খাঁকে রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ ওমরা পদে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি জাঁকজমক বড়ই ভাল বাসিতেন। অতএব অধুনা মহাসমারোহে উৎসব করিতে লাগিলেন এবং সাতিশয় সমৃদ্ধিসহকারে মহৎ মহৎ প্রাসাদ নির্ম্মাণার্থ ব্যাপৃত হইলেন। কিন্তু নূতন সম্রাট রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এক বৎসরকাল অতীত হইতে না হইতেই, তাঁহাকে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইতে হইল।

---

* এই সময় হইতেই নুরজিহানের নাম ইতিহাস হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়। তিনি ১৬৪৬ অব্দ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া ছিলেন। তাঁহার জন্য ২৫ লক্ষ টাকা বার্ষিকবৃত্তি নির্দ্ধারিত হয়। সকলে তাঁহাকে সম্মান করিত। নুরজিহান দ্বিতীয় বৈধব্যদশায় শ্বেতভিন্ন অন্য বর্ণের পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন না, কিম্বা কোন প্রকার উৎসবে মাতিতেন না, বোধ হইত যেন, পতিকে অনুধ্যান করত কাল কাটাইতেছেন। তিনি যে জাহাঙ্গিরের সমাধি মন্দিরের সন্নিকটে একটী মসিদ নির্ম্মাণ করেন, তাহাতেই তাহার মৃতাবশেষ নিহিত হইয়াছিল।

খাঁজিহান নামক একজন আফগান-সেনাপতি প্রথমতঃ দাক্ষিণাত্যের গবর্ণর নিযুক্ত হন, কিন্তু তিনি আমেদনগরের রাজার সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছেন দেখিয়া, সম্রাট তাঁহাকে দাক্ষিণাত্য হইতে মালবের শাসনকর্তৃত্ব পদে বদলী করিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে খাজিহান প্রভুর বিরুদ্ধ অভিপ্রায় আশঙ্কা করিয়া বিদ্রোহ উত্থাপন করিলেন। কিন্তু একদল মোগলসৈন্যের অনুসরণে বিব্রত হইয়া গোন্দয়ানার জঙ্গলে প্রবেশ পূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় যোগাযোগ করিতে লাগিলেন। জাহাঙ্গিরের মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ মল্লিক অম্বর মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। তৎপরে আমেদনগরের রাজা নিজাম সাহ স্বহস্তে শাসনকার্য্য চালাইতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁহার কার্য্য বৈধুর্য্যদোষে সকল বিষয়েই হুলস্থূল ঘটিতেছিল। খাঁজিহান লোদি নিজামসাহ হইতে কোন কার্য্যই সির্দ্ধ হইবে না দেখিয়া, বিজয়পুরের ও গোলকন্দার অধিপতিদিগকে মোগল রাজ্যের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করাইবার চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু তদ্বিষয়ে নিরাশ হইয়া স্বজাতির সহিত মিশিবার নিমিত্ত পেসোয়ারের দিগে ধাবমান হইলেন। যাহা হউক, তিনি অবিলম্বেই বুন্দেলখণ্ডের অন্তঃপাতি কালিঞ্জরনগরের সন্নিকটে মোগলসৈন্যকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিধন প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর সম্রাট আমেদনগর রাজ্য জয় করিবার জন্য সসজ্জ হইলেন। মল্লিক অম্বরের পুত্র ফতে খাঁ অধুনা প্রধান মন্ত্রিত্ব পদে অভিষিক্ত ছিলেন। তিনি কার্য্যবিধুর প্রভুকে অচিরায় সংহার পূর্ব্বক একটি অপোগণ্ড বালককে সিংহাসনে

স্থাপন করিলেন এবং কিছুকাল মোগলসৈন্য প্রতিরোধ করিতে যত্ন পাইলেন। কিন্তু পরিশেষে অনন্যোপায় হইয়া শত্রুপক্ষ অবলম্বন করিলেন। তখন মহারাষ্ট্র জাতীয় সাহজী নামক* একজন সর্দ্দার আর একটী বালককে নামমাত্র রাজা করিয়া, আমেদনগর রাজ্যের অন্তর্গত অনেকানেক জনপদ পুনর্ব্বার উর্দ্ধার করিয়া লইতে লাগিলেন। বিজয়পুরের অধীশ্বর মহম্মদ আদিলসাহ নিজামসাহের বিভ্রাট দেখিয়া প্রথমে বরং হৃষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে বুঝিতে পারিলেন যে আমেদনগর রাজ্য দিল্লীশ্বরের হস্তগত হইলে তাঁহার নিজের মঙ্গল নাই। তখন তিনি মোগলসৈন্যের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিলেন; কিন্তু পদে পদে পরাজিত হইতে লাগিলেন। ১৬২৯ ও ৩০ অব্দে দাক্ষিণাত্যে ভয়ঙ্কর মড়ক ও দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। তৎপ্রযুক্ত যাহাতে বৈরানল নির্ব্বাণ হয়, তদ্বিষয়ে কোন পক্ষই অনিচ্ছুক ছিল না। কিন্তু তথাপি আর ছয় বৎসরকাল সেই সংগ্রাম চলিয়া ছিল। পরে বিজয়পুরের অধিপতি সম্রাটের সহিত সন্ধিবন্ধন করিলেন এবং আমেদনগরের অন্তর্গত কয়েকটি জনপদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে কর দিতে সম্মত হইলেন। সাহজীও সাহজিহানের সম্মতিক্রমে মহম্মদ আদিলসাহের সরকারে নিযুক্ত হইলেন। এইরূপে সুপ্রসিদ্ধ আহমেদনগর রাজ্য দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িল। ইতিপূর্ব্বেই গোলকন্দার অধিপতি দিল্লীশ্বরের বিভীষিকায় শঙ্কিত হইয়া তাঁহাকে কর দিতে রাজি হইয়াছিলেন।

* এই সাহজীই সুপ্রসিদ্ধ শিবজীর পিতা।

১৬৩৭ অব্দে কান্দাহারের গবর্ণর আলিমর্দ্দন খাঁ পারস্য-পতির দৌরাত্ম্যে ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া সাহজিহানের হস্তে উক্ত নগর সমর্পণ করিলেন। সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নানা পুরস্কার প্রদান করিলেন এবং রাজ্যতন্ত্রসংক্রান্ত মহৎ মহৎ কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। আলিমর্দ্দন পূর্ত্তকার্য্য বিষয়ে যেরূপ কৌশল প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে সকলে চমৎকৃত হইয়াছিল। তিনি দিল্লী পর্য্যন্ত যে একটী কুল্যা নিখাত করান, উহা তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

অনন্তর সম্রাট দুর্দ্দান্ত অজবেগ জাতির নিকট হইতে বাহ্লিক প্রদেশ জয় করিবার নিমিত্ত দশ বৎসরকাল বৃথা প্রয়াস পাইলেন। তৎপরে কান্দাহার উদ্ধার করিবার জন্য * আর পাঁচ বৎসর পারস্যপতির সহিত সংগ্রাম করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তৎপরে দুইবৎসরকাল সর্ব্বত্র শান্তি ও কুশল অব্যাহত রহিল। কিন্তু অরঙ্গজীবের দুরাকাঙ্ক্ষা ও ধূর্ত্ততা বশতঃ দাক্ষিণাত্যে পুনর্ব্বার বৈরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

১৬৫২ অব্দে আরঙ্গজীব দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তৃত্বপদে নিযুক্ত হন। প্রথমাবধি তাঁহার মনে এই সংকল্প ছিল যে, কান্দাহার উদ্ধার করিতে না পারাতে যে পরাভব হইয়াছে, কোন না কোন উপায়ে আপনার পরাক্রমের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক উহার পরিহার করিবেন। তাঁহার মনস্কামনা পূরণ

* ১৬৪৮ অব্দে কান্দাহারনগর পুনর্ব্বার পারসীকদিগের হস্তগত হয়।

করিবার সুযোগও শীঘ্র উপস্থিত হইল। গোলকন্দা রাজ্যের অধিপতি কুতবসাহের সহিত তাঁহার প্রধানমন্ত্রী মীরজুমলার অকৌশল চলিতেছিল। মন্ত্রীবর এখন সুযোগ দেখিয়া আরঙ্গজীবের সাহায্য চাহিলেন। তিনি সহর্ষচিত্তে এই ঘরাও বিবাদে হস্তক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সম্রাটের এমন ইচ্ছা ছিল না, যে পুনর্ব্বার দাক্ষিণাত্যে বৈরানল উত্থাপন করেন, কিন্তু পুত্রের কুপরামর্শে কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য হইয়া সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তখন ধূর্ত্তরাজ আরঙ্গজীব ছলক্রমে কুতবসাহের রাজধানী হঠাৎ আক্রমণ পূর্ব্বক অধিকার করিয়া লইলেন। তন্নিবন্ধন তিনি মহাসঙ্কটে পতিত হইলেন এবং গত্যন্তর না দেখিয়া অতি সুকঠিন পণে রাজকুমারের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন।

এই সময়ে বিজয়পুরের অধীশ্বর মহম্মদ আদিলসাহের লোকান্তর হয় এবং তাঁহার পুত্র আলি রাজপদে অধিরূঢ় হন। কিন্তু আরঙ্গজীব, আলি মৃত রাজার প্রকৃত পুত্র নয়, এই ভাণ করিয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিলেন। তরুণবয়স্ক ভূপাল এইরূপে হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া নিতান্ত ত্রাসযুক্ত হইলেন এবং বিপক্ষকে প্রতিরোধ করিবার উপায় না দেখিয়া অতি সুকঠিন পণে শান্তির প্রার্থনা করিলেন। আরঙ্গজীব উহাতেও রাজি হইতেন না। কিন্তু এক অভাবনীয় ঘটনায় তাঁহাকে তদপেক্ষা গুরুতর বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে হইল।

সাহাজিহানের চারিপুত্র; সর্ব্বজ্যেষ্ঠ দারাসাঁকোর বয়স তৎকালে বেয়াল্লিশ বৎসর। তিনি স্বভাবতঃ উদার, অমায়িক

ও প্রপিতামহের ন্যায় একেশ্বরবাদী ; কিন্তু উদ্ধত, অল্প-সাহসিক ও অপরিণামদর্শী ছিলেন। সুজা তাঁহার চেয়ে দুইবৎসরের ছোট। তিনি নিতান্ত অক্ষম ছিলেন না, কিন্তু যৎপরোনাস্তি মদ্যাসক্ত ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ। আরঙ্গজীবের বয়স তখন আটত্রিশবৎসর। তিনি বিচক্ষণ, রণনিপুণ, ধৈর্য্যশীল, সদালাপী ও দেখিতে সুশ্রী ছিলেন, কিন্তু মুসলমানধর্ম্মের বড় গোঁড়া, দারুণ দুরাকাঙ্ক্ষ এবং ধূর্ত্ততায় অদ্বিতীয়। সর্ব্বকনিষ্ঠ মোরাদ বিলক্ষণ সাহসী ও নিতান্ত খোলা অন্তঃকরণের লোক ছিলেন। কিন্তু যেমন নির্বুদ্ধি ও অবিবেচক তেমনি একগুঁয়ে ও ইন্দ্রিয়দাস। দারা সম্রাটের অত্যন্ত স্নেহাস্পদ ও বিশ্বাসভাজন বলিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। অধুনা সাহজিহান অলস ও বিলাসপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং যুবরাজই রাজ্যতন্ত্রের অধিকাংশ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। সুজা বাঙ্গালার ও মোরাদ গুজরাটের গবর্ণরীপদে অভিষিক্ত ছিলেন। আরঙ্গজীব দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত হইয়া বিজয়পুর রাজ্য আত্মসাৎ করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন। এমন সময়ে সম্রাট হঠাৎ ভয়ঙ্কর রোগে আক্রান্ত হইলেন। সেই সম্বাদ পাইয়া শেষোক্ত তিন জন রাজপুত্র এক এক দল সৈন্য হইয়া রাজধানীর দিগে যাত্রা করিলেন। সুজা ও মোরাদ প্রকাশ্যরূপে রাজোপাধি ধারণ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। কিন্তু সুচতুর আরঙ্গজীব ওরূপ না করিয়া মোরাদের নিকট এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন যে, "ভ্রাতঃ! আমি ভোগবিলাসী বা রাজ্যাভিলাষী নহি ; কেবল এইমাত্র আমার মনের স্পৃহা

যে পুণ্যধাম মক্কায় গিয়া ইষ্টনিষ্ঠায় কালযাপন করি। তবে যে রণসজ্জা করিতেছি কেবল নাস্তিক দারা ও তাহার সেনা-পতি ধর্ম্মভ্রষ্ট যশোবন্ত সিংহের দর্পচূর্ণ করিব, এবং পিতাকে বুঝাইয়া তোমাকে রাজশ্রীতে ভূষিত করিতে পারিব এই জন্য।" মোরাদ এমনি নির্ব্বোধ যে, এই প্রতারণাবাক্যে সহজেই ভুলিয়া গেলেন।

দারা এপর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত ছিলেন না; প্রত্যুত অবিচলিত অধ্যবসায় সহকারে যুদ্ধের উদ্যোগ করিতেছিলেন। সর্ব্বাগ্রে একদল বাচা বাচা সৈন্য সুজার প্রতিকূলে প্রেরণ পূর্ব্বক আরঙ্গজীব ও মোরাদকে প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত বীরবর যশোবন্ত সিংহকে মালবদেশে স্থাপিত করিয়া রাখিলেন। সুজা বারাণসীর সন্নিকটে সহজে পরাজিত হইয়া নিজ অধিকারের মধ্যে ফিরিয়া গেলেন। এদিগে আরঙ্গজীব ও মোরাদ উজ্জয়িনীর উপকণ্ঠে যশোবন্তকে পরাভূত করিয়া আগ্রার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এখন সাহজিহান অনেকাংশে আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন; তিনি দারাকে বলিলেন, "পুত্র! তোমার বাচা বাচা ফৌজ সব সুজার বিপক্ষে প্রেরিত হইয়াছে, উহারা আগতপ্রায়; অতএব কিছুদিন তাহাদের প্রতিক্ষা কর, আপাততঃ সমরে প্রবৃত্ত হইও না।" কিন্তু তিনি পিতার এই হিতকর উপদেশ না শুনিয়া সসৈন্য বহির্গত হইলেন। ভাবিয়াছিলেন, যখন শত্রুর অপেক্ষা আমার সৈন্য সংখ্যা অধিক, তখন বৃথা কালক্ষেপ করার দরকার নাই; আমার জয়লাভ বিষয়ে আর কি সংশয় আছে! অনন্তর দুইপক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম

বাজিল। বহুক্ষণ জয়পরাজয় অনিশ্চিত রহিল। দারা সাঁকো এক বিপুল মাতঙ্গে আরূঢ় হইয়া ভয়ঙ্কর বেগে নিজ সৈন্য পরিচালন করিতে লাগিলেন। বোধ হইল বুঝি জয়লক্ষ্মী তাঁহার প্রতি পক্ষপাতিনী হন। এমন সময়ে একটা জ্বলন্ত হায়ুই তাঁহার হস্তির উপরে পতিত হওয়াতে সে নিতান্ত ক্ষেপিয়া উঠিল। যুবরাজ তাড়াতাড়ি নামিয়া একটা ঘোড়ার উপর চড়িয়া বসিলেন। কিন্তু সৈনিকগণ তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া ভয়ে আকুলিত হইয়া ছড়িভঙ্গ হইয়া পড়িল। তখন যুবরাজ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া দিল্লীর অভিমুখে প্রয়াণ করিলেন। আরঙ্গজীব ভক্তিসহকারে পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক "ভাই একটি রাজ্যলাভ করিলে" এই বলিয়া মোরাদকে অভিনন্দন করিতে লাগিলেন।

তৎপরে ভ্রাতৃদ্বয় রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। আরঙ্গজীব দেখিলেন যে, দারার উপর সম্রাটের যেরূপ স্নেহ আছে, উহা কিছুতেই অপনীত হইবার নহে। তখন তিনি বৃদ্ধপিতাকে আগ্রার কেল্লায় বন্দী করিয়া রাখিলেন। এইরূপে ১৬৫৮ অব্দে সাহজিহানের রাজত্বের অবসান হইল। ইহার পর তিনি আর আটবৎসরকাল বাঁচিয়া ছিলেন। যখন আরঙ্গজীবের অভিষেক হয়, তখন লোকে জয়ধ্বনি করিতেছে শুনিয়া দুর্ভাগ্য সম্রাট ধড়মড়িয়া উঠিয়া গৃহমধ্যে পায়চালি করিতে লাগিলেন; এবং মস্তকের উপরে যে একখান মুকুট ঝোলান ছিল, উহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। পরে স্নেহাস্পদ জাহানারাকে সম্বোধন পূর্ব্বক

বলিলেন, "বৎসে! এই ছাই ভস্ম আমার কাছ থেকে লইয়া যাও;" পরে একটু ভাবিয়া বলিলেন, "অথবা এখন থাকুক এই রাজ চিহ্নের প্রতি অনাদর করিলে, এক রকম স্বীকার করা হইবেক যে আরঙ্গজীব ন্যাষ্য কাজই করিয়াছে।" তদনন্তর কিছুকাল চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন, পরে বলিলেন, "জাহানারা! এই নূতন সম্রাট অকালে সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছেন; কেন বলি, তিনি যে সকল দুষ্কর্ম্ম করিয়া এই উচ্চতম পদ লাভ করিলেন, কই তন্মধ্যে ত পিতৃহত্যা নাই!" যখন অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন হইল, আরঙ্গজীবের পুত্র মহম্মদ উহার অপরিহার্য্যতাবিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করিবার জন্য পিতামহের নিকট আসিতে চাহিলেন। তিনি সরোষনয়নে বলিলেন, "অনেক পিতা পুত্রকর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়াছেন; কিন্তু আরঙ্গজীব ভিন্ন আর কেহ কখন পিতার দুর্দ্দাশার উপর অবমাননা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। কেবল নিজের দুরাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্যই সেই রাজদ্রোহী এই সাম্রাজ্য আত্মসাৎ করিয়াছে, ইহার আর কোন কারণ নাই। তাহার কুযুক্তিতে কর্ণপাত করিলেও তাহার আচরণকে ন্যাষ্য বলিয়া স্বীকার করা হইবেক।"

ভারতবর্ষের সমুদয় সম্রাট অপেক্ষা সাহজিহানের আমলে প্রজা লোকের সমধিক সৌভাগ্য সঞ্চার হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বকালে ভারতভূমিতে যেরূপ শান্তি ও সুশৃঙ্খলা বিরাজমান হয়, কদাপি তদ্রূপ দৃষ্ট হয় নাই। তিনি প্রজালোককে অপত্যনির্ব্বিশেষে পালন করিতেন; এবং

রাজ্যতন্ত্রের সমুদায়কার্য্যে এরূপ সুনিয়ম ও বন্দোবস্ত স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, যে কোনবিষয়ে গোল-যোগ ঘটিতে পারিত না। তিনি মুসলমান ধর্ম্মে পিতার অপেক্ষা শ্রদ্ধাবান ছিলেন, কিন্তু পুত্রের মত গোঁড়ামি করিতেন না। তিনি গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন—যৌবনকালে বরং গর্ব্বিত ছিলেন; কিন্তু বয়সের পরিণতির সহিত সে ভাব অনেক শুধরাইয়া আসিয়াছিল। তিনি যে স্বভাবতঃ ধীর, বিচক্ষণ ও মনস্বী ছিলেন, তাঁহার অতি বাল্যকালেও উহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যৎকালে মহাত্মা আকবর মৃত্যুশয্যায় শয়ান ছিলেন, খসরুকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ঘোরতর চক্রান্ত হইতেছিল। সুতরাং সেলিম ও তাঁহার পুত্রগণের রাজবাটীতে যাতায়াত একবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু কুমারখরম * তখন দশমবর্ষীয় বালক মাত্র; তিনি পিতার অনুরোধ না শুনিয়া এবং নিজের বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া, এই কথা বলিয়া ছিলেন যে, "যতদিন ঠাকুরদাদা মহাশয় বাঁচিয়া থাকিবেন, আমি কখনও তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইবনা। সাহজিহান দাক্ষিণাত্যের জরিপ করিতে প্রবৃত্ত হন। কথিত আছে, প্রায় কুড়িবৎসর কাল নিয়ত পরিশ্রম করিয়া জরিপকার্য্য সমাধা করেন। পরে তোদরমল্লের সুপ্রসিদ্ধ রাজস্ব পদ্ধতি উক্ত প্রদেশে প্রচলিত করিয়া দেন। কোন সম্রাট সাহজিহানের ন্যায় জাঁকজমক ভাল বাসিতেন না। অথবা পূর্ত্তকার্য্যে তাঁহার মত দক্ষতা

* সাহাজিহান প্রথমে এই নামে পরিচিত ছিলেন

প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তিনি এক নূতন প্রণালীতে দিল্লীনগর পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করেন। তজ্জন্য মুসলমানেরা দিল্লীকে সাহজিহানাবাদ বলিয়া থাকে। তিনি যে এক মণিখচিত ময়ূরাকার সিংহাসন প্রস্তুত করেন, উহাতে সাড়েছয় কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি আগ্রানগরীতে নিজ মহিষী মম তাজমহলের যে এক সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করেন, উহার তুল্য অদ্ভুত প্রাসাদ ভূমণ্ডলে আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এই চমৎকারজনক মন্দির মার্বেলে নির্ম্মিত ও নানা বর্ণের মণিতে খচিত। ইহা তাজ-মহল নামে ভূমণ্ডলে প্রসিদ্ধ। তথাপি সাহজিহান বিলক্ষণ মিতব্যয়ী ছিলেন। তিনি মরণকালে ভূরি পরি-মাণ স্বর্ণ, রৌপ্য, মণিমাণিক্য ব্যতীত চব্বিষ কোটি টাকা মজুত রাখিয়া যান।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মোগল সাম্রাজ্যের অবনতির পূর্ব্বলক্ষণ।

আরঙ্গজীব। ১৬৫৮—১৭০৭।

এইরূপে আরঙ্গজীব আগ্রার সিংহাসনে অধিরোহণ করি-লেন। যদিও তিনি অবিলম্বে মোরাদকে ছলপূর্ব্বক কয়েদ করিতে পারিলেন, তথাপি তাঁহার পক্ষে নিরাপদে রাজ্য-ভোগ করিবার অনেক বাধা রহিল। দারার পুত্র সলিমান

সুজাকে পরাজয় পূর্ব্বক অগ্রসর হইতে ছিলেন। নূতন সম্রাট ভেদোপায়দ্বারা তাঁহার প্রধান সেনাপতি জয়সিংহ ও দিলীরখাঁকে স্বপক্ষে আনিলেন। তখন সলিমান গত্যন্তর না দেখিয়া হিমালয়ের দিগে পলায়ন পূর্ব্বক শ্রীনগরের অধিপতির শরণাপন্ন হইলেন। কিন্তু তিনি জয়সিংহের প্ররোচনাবাক্যে কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য হইয়া, উক্ত রাজপুত্রকে সম্রাটের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

এদিগে সুজা অগ্রসর হইয়াছিলেন। আরঙ্গজীব তাঁহার প্রতিরোধার্থ দ্রুতপদে ধাবমান হইলেন। এলাহাবাদ ও ইটোয়ার মধ্যে দুইপক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইল। পরিশেষে সম্রাট জয়লাভ করিলেন! তখন আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদ সুলতান ও প্রসিদ্ধ সেনাপতি মীরজুমলাকে ভ্রাতার অনুসরণার্থ প্রেরণ পূর্ব্বক, নিজে অবিলম্বে দারাসাঁকোর প্রতিকূলে অভিযান করিলেন। আজমীরের সন্নিকটে দুই দলে সাক্ষাৎ হইল। দারা মহাসাহস সহকারে কিছুকাল সমর করিয়া রণ হইতে ভঙ্গ দিলেন, এবং সিন্ধুর পূর্ব্বদিগস্থিত জুননামক জনপদের সর্দ্দারের নিকট আশ্রয় লইলেন। কিন্তু তিনি যুবরাজের পূর্ব্ব উপকার বিস্মরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিলেন। নূতন সম্রাট দারার নামে ধর্ম্মভ্রষ্ট এই অপরাধের অভিযোগ করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডের হুকুম দিলেন।

রাজকুমার সুলতান সুজার বিপক্ষে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি মিরজুমলার কর্কশব্যবহারে অত্যন্ত চটিয়া উঠিয়া ও পিতৃব্যকন্যার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া নিজ শিবির

পরিত্যাগপূর্ব্বক সুজার পক্ষ অবলম্বন করিলেন। কিন্তু কিছুদিন অতীত না হইতেই আবার তাঁহাকে ছাড়িয়া মিরজুমলার নিকট উপস্থিত হইলেন। আরঙ্গজীব এমন লোক ছিলেন না, যে কোন অপরাধীর মাপ করেন। অতএব মহম্মদ সুলতান শীঘ্র কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। তথায় তিনি সাতবৎসর অতিবাহন করিয়া মনের খেদে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। অনন্তর মিরজুমলা সুজাকে পরাজয়পূর্ব্বক তাঁহার রাজধানী অধিকার করিয়া লইলেন। সুজা অনন্যগতি হইয়া আরেকানের রাজার নিকট আশ্রয় লইলেন। তথায় তিনি সপরিবারে মারা পড়েন, কিন্তু আরঙ্গজীব উহার কোন নিশ্চয় খবর না পাইয়া আরও কিছুকাল শঙ্কাকুল হইয়া কালযাপন করেন। অনন্তর দারাসাঁকোর পুত্র সলিমান ও সেপহর এবং মোরাদের এক পুত্র গোয়ালিয়ারের দুর্গে বিষাক্ত ঔষধ সেবনে প্রাণত্যাগ করিলেন। অবিলম্বেই আরঙ্গজীবের প্রবর্ত্তনায় একব্যক্তি আসিয়া নালিস করিল, যে মোরাদ যৎকালে গুজরাটের গবর্ণর ছিলেন, তাঁহার পুত্রকে নিধন করেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণদণ্ডের হুকুম বাহির হইল এবং দুর্ভাগ্য মোরাদ উক্ত কেল্লার মধ্যেই জহ্লাদের হস্তে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে নূতন সম্রাট রাজ্যের সমুদয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে সংহার পূর্ব্বক নিষ্কণ্টক হইলেন।

মীরজুমলা সুজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া আসাম বিভাগ আক্রমণ করেন এবং উহার অধিকাংশ স্ববশে আনেন। তাঁহার এমন মতলব ছিল যে, চিনরাজ্যে অভিযান পূর্ব্বক

দিল্লীশ্বরের জয়পতাকা উড্ডীয়মান করিবেন। কিন্তু বর্ষার সমাগমে আসামের অধিকাংশ ডুবিয়া গেল। সুতরাং সেনাপতি তথা হইতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। পথি মধ্যে তাঁহার সৈনিকগণ বর্ষার সাপটে, শত্রুর আক্রমণে রোগের প্রাদুর্ভাবে ও রসদের অসদ্ভাবে ক্লেশের একশেষ সহ্য করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে লাগিল, এবং সেনাপতি নিজে ঢাকায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই কালকবলে পতিত হইলেন (১৬৬৩)। মিরজুমলার অসাধারণ ক্ষমতাদর্শনে সম্রাট তাঁহার প্রতি বরাবর ঈর্ষ্যাযুক্ত ছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যুতে এক প্রকার স্বস্তিলাভ করিলেন, এবং তাঁহার পুত্রকে এই বলিয়া পত্র লিখিলেন যে "তুমি পিতৃহীন হইলে এবং আমিও নিজের সর্ব্বপ্রধান অথচ সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্ধর্ষ মিত্রকে হারাইলাম।"

এই সময়ে সম্রাট সঙ্কটাপন্ন রোগে আক্রান্ত হন। তৎপ্রযুক্ত সাহজিহানকে সিংহাসনে পুনঃস্থাপন করিবার জন্য ষড়্‌যন্ত্র হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু তৎকালেও তিনি এরূপ অবিচলিত অধ্যবসায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন, যে সকল গোলযোগ সহজেই নিরস্ত হইয়া গেল। ইহার কিঞ্চিৎ পরে সাহজিহান পরলোক যাত্রা করেন (১৬৬৬)। যদিও পিতাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া আরঙ্গজীব এক মহাপাতকের কার্য্য করিয়াছিলেন, তথাপি পরে যেরূপ ভক্তি ও নম্রতা সহকারে তাঁহার প্রতি ব্যবহার করেন, উহা প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই। একদা তিনি পিতার নিকট এই প্রার্থনা করিয়া পাঠান যে, দারার কন্যার সহিত আমার চতুর্থ পুত্র

আকবরের বিবাহ দিতে অনুমতি করুন। সাহজিহাঁ কিন্তু ক্রোধে অধীর হইয়া এই উত্তর দিলেন, যে "তাহা এই রাজদ্রোহী যেমন মহাপাতকী তেমনি গর্ব্বিত।" আর এক সময়ে তিনি নিজ সিংহাসন সজ্জিত করিবার জন্য পিতার নিকট কতকগুলি জহরত চাহিয়া পাঠান। তখন সাহজিহান বলিয়া উঠেন যে, যদি সে বলপূর্ব্বক আমার জহরত গ্রহণ করিতে উদ্যত হয়, তবে নিশ্চয়ই ঐ সমস্ত হাতুড়ির আঘাতে চূর্ণ করিয়া ফেলিব। আরঙ্গজীব এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "তিনি আপনার জহরত নিজের কাছেই রাখুন, এবং আরঙ্গজীবেরও যাহা কিছু আছে, উহা তাঁহারই আজ্ঞাধীন।" পুত্রের এইরূপ নম্রতাদর্শনে প্রাচীন ভূপাল দুঃখিত হইলেন এবং এই বলিয়া কতকগুলি মনিমানিক্য পাঠাইয়াদিলেন যে, "কয়েকটি জহরত পাঠাইয়াদিতেছি গ্রহণ কর। আমার জন্মের শোধ উহা ধারণ করা হইয়াছে। গৌরবের সহিত এই সকল ধারণ কর এবং লোকের নিকট প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া কিছু পরিমাণে পরিবারবর্গের দুর্ভাগ্য দূর কর।" এই কথা শুনিয়া আরঙ্গজীব অশ্রুজলে ভাসমান হইলেন। বস্তুতঃ সম্রাট পিতার প্রতি নিরন্তর ভক্তিও ক্ষমা প্রকাশ করিয়াও সময়ে সময়ে তাঁহার পরামর্শ চাহিয়া পাঠাইয়া অনেকাংশে তাঁহার কোপশান্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মনোদুঃখ দূত করিতে পারেন নাই। অবশেষে পিতার চরমকাল উপস্থিত শুনিয়া যদিও নিজে তাঁহার সন্নিধানে যাইতে সহসী হন নাই, আপনার পুত্রকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পরে, তাঁহার মৃত্যুসম্বাদ